পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নওজোয়ান কবিতা মজলিস

চরিত্র

তবাররুক আহাম্মদ
ফৈয়াজ মালী খোরশান
খোরশান রকিব
কিয়া ও সিদ্দিন জায়গিরদার
মোনায়েম খান্নাস
বেগম খোশবু আহাম্মদ
শর্মিলা বেগম
সভর্তৃকা গুহ (কুমারী)

[ইঁহারা সবাই "নওজোয়ান কবিতা মজলিসের" সভ্য-সভ্যা। শহরে ব্ল্যাকআউট থাকায় প্রতিমাসে একবার করিয়া পূর্ণিমা রাতে ইঁহারা একস্থানে মিলিত হন এবং নয়া আদব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তবে মজলিসের একটি বিশেষ নিয়ম হইতেছে যে আসরে প্রত্যেকেই নিজের নিজের লেখা পড়িবেন।]

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৩৪৯, পৌষ মাস

বেলা : রাত্রি আসন্ন

[কলিকাতায় কোনো এক অখ্যাতনামা পাড়ায় শীর্ণ একটি গলিতে জ্যোৎস্নার রোশনাই সবে জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মন্থর গতিতে শর্মিলা বেগম এবং খোশবু আহাম্মদ সাহেবার প্রবেশ।

শর্মিলা : জ্যোৎস্না তোমার খুব ভালো লাগে, না বু ?

খোশবু : তা নইলে অমন ছটফট করে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম!

শর্মিলা : সত্যি বু, আমারতো রীতিমত ভয়ই লেগে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল চাঁদের আলো তুমি যেন খামচে খামচে মনের কোণায় ভরে নিচ্ছিলে। আমার কিন্তু চাঁদের আলো ভারি বিচ্ছিরি লাগে!

(মিডিয়াম হিলের জুতার অগ্রভাগ দিয়ে একটা পতিত ইট খণ্ডকে জোরে শট করিল)

খোশবু : মিথ্যুক, তবে তুই কেন পার্কে ঘুরছিলি ? মিটিং আরম্ভ হবে তো সেই আটটায়।

শর্মিলা : ওঃ সেই কথা! সে এক মজার ব্যাপার। বিকেলবেলায় ঐ এসপ্লেনেডের মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় বোধহয় একটা ফরসা-পানা ছেলের দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলেছিলাম।

খোশবু : ছিঃ ছিঃ, তোর কি একটুও লজ্জা নেই!

শর্মিলা : শোনই সবটা আগে! হঠাৎ হোস্টেলে ফেরার পথে একবার পেছন ফিরে দেখি ছেলেটা দূর থেকে আমায় লক্ষ করছে। বোধহয় ঠিকানা জানবার লোভে বেচারা অতটা পথ ফলো করেছিল। আমার কেমন বেশ মজা লাগলো। তাই এলোমেলো খুব কতক্ষণ ট্রাম থেকে বাস, বাস থেকে পায় হেঁটে চলতে লাগলাম— শেষটায় ঢুকলাম তোমাদের ঐ পার্কে। ছেলেটাও বোধহয় ঐ সন্ধ্যা লাগে লাগে সময় আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল— চলে গেল !

খোশবু : কী বেহায়া মেয়েরে তুই, তোর কি কিছুই মুখে বাধে না শমি ?

শর্মিলা : বুকের বাঁধনেই সারা হলাম, আবার মুখেও ফাঁসি দিবি হায়রে!

(দুঃখের আতিশয্যে পথিমধ্যে শায়িত একটি খালি কাগজের ঠোংগাকে জুতার প্রবল খোঁচায় ফাঁসাইয়া দিল)

খোশবু : আজকের সভার জন্যে কবিতা এনেছিস ?

শর্মিলা : হ্যাঁ।

খোশবু : তুই নিজে লিখেছিস ?

শর্মিলা : না।

খোশবু : তোর ক্লাস নাইনে পড়ুয়া ছোটবোনের খাতা থেকে চুরি করা ?

শর্মিলা : হ্যাঁ। কী যে তুমি প্রশ্ন কর বু ? ছোটবোনের খাতা থেকে চুরি না করলে পাবো কোথায় ? আমার তো আর তেমন—

খোশবু : নিজে চেষ্টা করিস না কেন ?

শর্মিলা : আমি লিখব..প্রেমের কবিতা ? হি... হিহি.. হি। প্রেম নিয়ে কবিতা লেখার মতো শুকনো প্রবৃত্তি এখনও বাকি আছে নাকি ? ও-সব প্রথম প্রথম চলে, এই ক্লাস নাইন টেন অবধি।

(দুই জনেই নীরবে চলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর খোশবু আহাম্মদ কিছুটা উদাস হইয়া ধীরে ধীরে শর্মিলা বেগমের কাঁধেব ওপর হাত রাখিল)

খোশবু : জানিস শমি, কবিতা লিখতে আমার খু-ব ভালো লাগে।

শর্মিলা : প্রেমে পড়াব চেয়েও ?

খোশবু : ভালোবাসার কবিতা লিখতে লিখতে আমাব ইচ্ছে হয় সমস্ত দেহ নিংড়ে ওতে আমার সকল অনুভূতি স্তূপীকৃত করে দি।

শর্মিলা : আচ্ছা বু তোমার কবিতা লেখার অনুভূতি চাড় দিয়ে ওঠে কখন ? টাইমস পত্রিকার বিজ্ঞাপন ঘাঁটতে ঘাঁটতে ?- মাশী খোবশান সাহেবের কিন্তু তাই হয়।

খোশবু : আমি যখন কবিতা লিখি আমি চাই সমস্ত প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে নিজের মধ্যে পেতে। আমার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই তার কী আস্বাদন— উপচে ওঠা আলোর স্পর্শ। তাই প্রথমে করি কি অঙ্গ থেকে...

(এই খানে হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল এবং শর্মিলার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিসফিস করিয়া অসম্পূর্ণ বাক্য শেষ করিল। শর্মিলা হাসিল, হি হি— হিহিহি— হি...)।

তারপর দরজা বন্ধ করে এলিয়ে দি সমস্ত শবীব। খোলা জানালা দিয়ে আমার নির্বসনা দেহ ভেঙে পড়ে আলোব বন্যা।—

শর্মিলা : তোমার ঘরে চড়ুই পাখি আসে না বু ?

খোশবু : আসে তো, কেন ?

শর্মিলা : না তা হলে আমি পারতাম না। ঘরে চড়ুই পাখি থাকলে শু'তে আমার বড় লজ্জা করে। (খিলখিল করিয়া দুইজনেই হাসিয়া উঠিল) (নীরবতা)

খোশবু : আচ্ছা মালী খোরশান সাহেবের কবিতা তুই তো অনেক পড়িস, কেমন লাগে ?

শর্মিলা : মালী খোরশান সাহেবের সুরতে মোবারক তোমার কেমন লাগে বু ?

খোশবু : আহ্ কী ছ্যাবলামো করছিস ? ওনার কবিতা তোর কেমন লাগে ?

শর্মিলা : বাঃ কবির চেহারা সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করার আগ অবধি কী করে বলি যে ওঁর কবিতা ভাল লাগে কি লাগে না ? তুমি পারো ? কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদারকে দেখার আগে তুমি কোনোদিন জানতে পেরেছিলে যে ও ব্যাটার লেখা তোমার অতো পছন্দ হয় ?

খোশবু : (আরক্তিম মুখে) শমি !

শর্মিলা : মাফ চাইছি। ও নাম নিয়ে আর ঠাট্টা করবো না।

খোশবু : মালী খোরশান সাহেবের চশমার ফ্রেম খুব সুন্দর— এবার বল ওর কবিতা কেমন লাগে ?

শর্মিলা : তাহলে সত্যি কথাই বলে ফেলি। ওর কবিতা পড়ার সময় আমার কী মনে হয় জানো বু ? মনে হয় যেন প্রত্যেক অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে T. S. Eliot লুঙ্গি পরে ধেই ধেই করে সাঁওতালী নাচ নাচছে। আর নাচের ছন্দের সে কী বাহার! বুন্দেলী রোশনাই যেন ঠিকরে ঠিকরে—

(হাসির অত্যধিক উচ্ছ্বাস না রুখিতে পারিয়া খোশবু আহাম্মদ নিজের মুখে জাপানি রুমালিকা গুজিয়া দিল এবং অন্য হাতে শর্মিলার মুখ চাপিয়া ধরিল)

খোশবু : উহ্ ! (হাসি) শমি, থাম্-থাম্। (একটু পরে) কটা বাজলো রে ?

শর্মিলা : (হাতঘড়ি দেখে) সারে সাত, এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।

খোশবু : তবু চল্, আমরা এখনই যাই। ওখানে বসে বসে আলাপ করা যাবে।

(উভয়ে চলিতে থাকে। রঙ্গমঞ্চের পদপ্রান্তে আসিয়া আচমকা শর্মিলা বেগম দাঁড়াইয়া পড়িল। খোশবু আহাম্মদ সাহেবাও থামিল। শর্মিলার মুখ গম্ভীর এবং ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।)

খোশবু : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) আবার কী হলো রে ?

শর্মিলা : (অস্ফুট কণ্ঠে) তবাররুক আ-আ-হাম্মদ সা-আ-হে-ব!

(মুহূর্তের মধ্যে খোশবু আহম্মদ সাহেবার মুখও বিবর্ণ হইয়া গেল)

খোশবু : (হতাশা আর্তনাদের সুরে) তাইতো— মনেই ছিল না।

শর্মিলা : না না, এ অত্যাচার আমি আজ আর কিছুতেই মানব না।

খোশবু : কী আর করবি শমি, তবাররুক সাহেব প্রেসিডেন্ট যখন, তখন তাকে মেনে নিতেই হবে।

শর্মিলা : না, এ অসম্ভব। শুধু তুমি মনের বল হারিয়ো না বু'। এর প্রতিকার আজ

আমি করবই দেখে নিও। উহ্! কী ভয়ঙ্কর! প্রেসিডেন্ট বলেই কি তিনি তাঁর ঐ (খুব জোরে) ঐ চারশ লাইনওয়ালা অসংলগ্ন, অযৌক্তিক, অস্বাস্থ্যকর কবিতা আমাদের জোর করে শোনাবেন। এ রীতিমতো মানসিক ব্যাভিচার।

খোশবু : শমি বড় উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ তুমি।

শর্মিলা : উত্তেজিত হব না কেন? তুমি না হয় কিয়াওমিদ্দিন সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে নির্বিবাদে দু'চার ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি? প্রচণ্ড উৎসাহে আমাকে তখনও শুনে যেতে হবে তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের নিষ্কাম, নিরুদ্বেগ কবিতাকে যে-কোনো অনিশ্চিত সময়ের জন্য। তাও যদি—

খোশবু : শর্মিলা!

শর্মিলা : (ভ্রুক্ষেপ না করিয়া) তাও যদি (মৃদু ফোঁপানির সুর) খোরশান রকিব সাহেব মাঝে মাঝে আমার দিকে এক আধবার চোখ তুলে চাইত! না, না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

খোশবু : কী করবি?

শর্মিলা : দু'শো লাইনের বেশি হলে বাধা দেবো। না শুনলে বেরিয়ে আসবো।

খোশবু : পারবি তো, কী বলবি?

শর্মিলা : সে একটা অজুহাত খুঁজে নেবই। সেটুক না পারলে আর মেয়ে হয়ে জন্মেছি কেন?

(একটু মুচকি হাসিল। পুনর্বার গম্ভীর হইয়া দৃঢ়চিত্তে, দৃপ্ত পদ-বিক্ষেপে, যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে খোশবুকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। শর্মিলা এবং খোশবু বাহির হইয়া যাইতেই একটা ডাস্টবিনের পিছন হইতে কবি মোনায়েম খান্নাস চুপে চুপে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

মোনায়েম খান্নাস (ডান হাতে আচকান ঠিক করিতেছেন এবং বাম হাতে কপালের একটা ফুলা অংশকে টিপিয়া ধরিতেছেন। মুখ বেদনা এবং বিরক্তিতে কুঞ্চিত) বাব্বাঃ কী সাংঘাতিক মেয়েরে : খেলার ছলে ইটকে শুট করলো— মনে হলো যেন জুম্মা খাঁ রিটার্ণ কিক মারলেন! আরে সেই ইঁট পড়বিতো পড় এক্কেবারে পড়লো আমারই পোড়া কপালে! (কপালটা ভাল করিয়া টিপিয়া ধরিল) ভীষণ ফুলে উঠেছে যেন। তা যাক, তবু শর্মিলা কথাটা বেশ বলেছিল। মালী খোরশান সাহেবের কবিতা যেন (হাসে ও ভাবে) ঠিকই তো, ও আবার কবিতা নাকি?... কিন্তু আমার কবিতা সম্বন্ধে ওনার কী মত সেটা জানতে পারলে মন্দ হতো না। নিশ্চয়ই খুব ভালো— নিশ্চয়ই—

(কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদারের প্রবেশ)

কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার আদাব আরজ, খান্নাস সাহেব, মেজাজ শরীফ?

খান্নাস : ইয়ে, এই দোয়া আপনাদের।

জায়গিরদার : তা একলা একলা কী করছিলেন ?

খান্নাস : এই মানে একটু পায়চারি আরকি, চাঁদের আলোয় ঘোরাফেরা মাত্র।

জায়গিরদার : কিন্তু আপনার কপালে ওটা কী ? বাৎ কেয়া হ্যায় ?

খান্নাস : ইয়ে, মানে সংঘাত, আকস্মিক সংঘাত।

জায়গিরদার : আকস্মিক সংঘাত ? তা আপনাদের মতো intellectual-দের সেটা কি মাথার খুলিতে না ঘটে মাথার ভেতরে ঘটলেই কি স্বাভাবিক হতো না ?

খান্নাস : (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) আমার একটা দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে আপনার অতটা রসালভাবে ব্যঙ্গজনক হয়ে ওঠার কোনোই প্রয়োজন নেই। ব্যাথা পেয়েছি অন্য কারণে—

জায়গিরদার : কারণটা শুনতে পারি কি ?

খান্নাস : গভীর চিন্তে একটা কিছু ভাবতে ভাবতে একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম। পথ চলতে গিয়ে টের পাইনি একটা ল্যাম্পপোস্ট আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ঘটনাটা কাজেই বুঝতে পারছেন।

জায়গিরদার : oh! sure sure ! জরুর! সত্যি আজকাল ল্যাম্পপোস্টগুলো বড্ড অসভ্য হয়ে উঠেছে। যেখানে সেখানে হা করে দাঁড়িয়ে থেকে পথিক সুজনের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসে! (একটু হাঁটে) তা একটা কথা, এপথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছেন কি ? I mean মিস খোশবু আহমেদ কিম্বা অন্য কাউকে ?

খান্নাস : (অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে) না-ও!

জায়গিরদার : (সিগারেট কেস খুলে) Never mind. Have a cigarette.

খান্নাস : না, শুকরিয়া, ওটা আমি খাই না।

জায়গিরদার : (আরেক পকেট হইতে বিড়ির কৌটা বাহির করে) ওহ্, তা ওটাও আছে এই নিন্।

খান্নাস : ধন্যবাদ, (একটা নেয়) কিন্তু আপনার সাথে দু'রকমই মজুদ যে ?

জায়গিরদার : আহ এও বুঝলেন না ? ওই খাকিটা হচ্ছে রাজনৈতিক সভার জন্যে আর এটা হলো সাহিত্য আসরের জন্যে। তা চলুন এবার এগুই।

খান্নাস : কোথায় ?

জায়গিরদার : কেন আপনাদের মজলিসে! যেখানে আমার কবিতা খুব মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করবেন আপনি আর আপনার কবিতার দার্শনিক রসের রথে চড়ে আমি যাব স্বর্গোদ্যানে। এবং তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের কবিতার কাব্যবাণে আমরা সবাই একত্রে জর্জরিত হবো মহা উল্লাসে।

খান্নাস : এ্যাঁ-ও ! তবাররুক, তবাররুক কী ভয়ঙ্কর! অন্যকে নিজের চার লাইন কবিতা শোনাবার লোভে ঐ কবি পাষণ্ডের চারশ লাইন ছন্দবদ্ধ পাশবিকতা সহ্য করতে হবে ? অ্যা...? কী কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

(প্রবল বেগে ফুলা কপাল চাপিয়া ধরিয়া টলতে টলতে প্রস্থান করিল। জায়গিরদার সেই দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিলেন তারপর তিনিও বাহির হইয়া গেলেন।)

(প্রায় সাথে সাথেই ফৈয়াজ আলী খোরশান সাহেবের কাঁধে ভর করিয়া কুমারী সভর্তৃকা গুহের ধীর প্রবেশ। সভর্তৃকা গুহের বাঁ হাত একটা স্লিং-এ কাঁধে ঝুলানো, অন্যহাত বাহু ভর করিয়া আছে। মনে হইতেছে যেন হাতে ব্যথা পাওয়াতে ভদ্রমহিলার পায়ে চলিতে একটু কষ্ট হইতেছে!)

সভর্তৃকা গুহ : দাও এবার হাতটা ছেড়ে দাও, এতটুকুন রাস্তা আমি একলাই চলতে পারব।

ফৈয়াজ মালী : থাক না, কেন খামকা কষ্ট করবে, আমার কাঁধে ভর করেই না হয় আরেকটু চললে, দোষ কী ? তারপর না হয় একলা একলাই চল।

সভর্তৃকা : না, না, ছিঃ কেউ দেখে ফেললে কী বলবে, তার চেয়ে এমনি ভালো।

(হাতটা মুক্ত করিয়া চলিতে থাকে) জানো মালী, ঘণ্টাখানেক আগে যখন আমি আর তুমি পার্কে বসেছিলাম, এই রুপোলি চাঁদটা এতটা সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন...যেন (আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে)

ফৈয়াজ : ভর্তা (চশমা পরিষ্কার করে) ওরা কারা ঐ সামনে চলছে ?

সভর্তৃকা : কবি খান্নাস মশায় এবং কবি জায়গিরদার মশায় বোধ হয়।

ফৈয়াজ : ওহ্ কবি ! ছোঃ ওদের আবার কবিতা হয় নাকি ? ছন্দ নেই, রুচি নেই, শুধু দুর্বোধ্য দর্শনবাদ দর্শাবার ফাঁপা ইচ্ছে থাকলেই কবি হওয়া যায় না, তাহলে এতদিনে (নিজস্ব প্রিয় ফর্মুলার প্যাঁচে ধরিয়া) এতদিনে একটা কলেজ স্কোয়াবের T. S. Eliot হয়ে উঠতে পারতেন।

সভর্তৃকা : আর ঐ জায়গিবদার মশায়েব কবিতাও আমার এতটুকু পছন্দ হয় না। কেমন একটা বর্বর উল্লাস প্রত্যেক বাক্যে মাথা উঁচিয়ে থাকে। একটা কর্কশ ঔদ্ধত্য যা-যা যে-কোনো সৎস্বভাবা ভদ্র মহিলার পক্ষে সভ্য অবস্থায় পড়া নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষ করে বঙ্গদেশেব ঐ উষ্ণ অঞ্চলের পক্ষে ও-রকম ভ্যাপসা কবিতা রীতিমত অস্বাস্থ্যকর।

(এই অবধি বলিয়া হাঁপাইয়া ওঠে। হাঁটে, তারপর আবার চাঁদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। উদাস সুরে)

চাঁদটা কী সুন্দর ! যেন, যেন—

ফৈয়াজ : যেন নীল শিরা বসানো প্রেয়সীর গালফুলো মুখ।

সভর্তৃকা : যেন মোল্লা সাহেবের উষ্ণীষ !

(উভয়ে উভয়ের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহে)

ফৈয়াজ : কিন্তু জানো ভর্তা, আজকের ঐ অমর চাঁদ আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

সভর্তৃকা : (ব্যথিত কণ্ঠে) চুরচুর ?

ফৈয়াজ : থরে থরে গলে ঝরে পড়বে।

সভর্তৃকা : ঝড়ে পড়বে, কেন, কীসের দুঃখে ?

ফৈয়াজ : (সমস্ত মুখ বিকৃত করিয়া) তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের বিরামহীন কবিতার কষাঘাতে—এত শুধু জ্যোৎস্নার রুপালি আভা-অন্ধকারে খবিসের লোলুপ চোখের জ্যোতিও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে ঐ কবিতার বিচ্ছুরিত আভায় (অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে) তবু আমি যাব, যেতে হবে, তা নইলে কোথায় পাব লোক, কাকে শোনাব আমার গীতধ্বনি।

সভর্তৃকা : তবু যাব। (পাণ্ডুর হাসি) তবু যাব, আমাদের যেতে হবে।

[আস্তে পর্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের ইমামতিতে 'নওজোয়ান কবিতা মজলিসের' আসর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাঝারি রকমেব বড় একটা হল কামরা। মেঝেতে পুরু ফরাস পাতা। তাহারই এক মাথায় একটা গোলাকার রঙিন কাপড়ে অদ্যকার সভার ইমাম সাহেব তশরিফ রাখিয়াছেন। তাহার পাশে অপেক্ষাকৃত অল্প দামি আরেক টুকরো রঙ্গিন কাপড়ের ওপর মোকাব্বের ফৈয়াজ মালী খোরশান সাহেব আত্মাহিয়াতোর ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন। সামনে অর্ধচক্রাকারে সমিতির অন্যান্য সভ্য-সভ্যারা বসিয়া। ঘরেব পেছন দিকে কতগুলি চেয়ার টেবিল স্তূপিকৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।]

(একটু ফূর্সী হুক্কা হইতে একটি বিরাট নল সব্বাইকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া ইমাম সাহেবের হাতের কাছে শেষ হইয়াছে।)

তবাররুক : আজকের মজলিসে গত আসরের রিপোর্ট পড়া হোক।

ফৈয়াজ : (লম্বা একটা খাতা খোলে এবং চশমাটা ঠিক করিয়া লয়) গত ১৯শে নভেম্বর আমাদের এই মজলিসের এক বৈঠকে এই গৃহেই হাসেল হইয়াছিল। সমিতির রেওয়াজ মতো করিবন্ প্রত্যেক উপস্থিত বান্দা মাত্রেই তাঁহার শের এখানে পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে প্রত্যেকের ওয়াখ্‌ত হাজির করা হইল :

বেগম খোশবু আহাম্মদ	— তিন মিনিট
শর্মিলা বেগম	— দুই মিনিট
কুমারী সভর্তৃকা গুহ	— চার মিনিট
ফৈয়াজ মালী খোরশান	— চার মিনিট
মোনায়েম খান্নাস	— পাঁচ মিনিট
কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার	— চার মিনিট

তবাররুক আহাম্মদ — তিনঘণ্টা ত্রিশ মিনিট

ইসতরেই রাত সাড়ে বারোটার সময় মজলিস খতম হয়।" মঞ্জুর ?

খান্নাস : আমার জরাসি আপত্তি। জনাব ইমাম সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে ব্যাকরণ মতে মোকাব্বের সাহেবের "বান্দা" শব্দের অর্থ মজলিসের একটা সু-অংশকে মর্মান্তিকভাবে ঘায়েল করে নাই ?

তবাররুক : (হাসিয়া) ঠিক হ্যায়, মোকাব্বের সাহাবই ঠিক হ্যায়।

ফৈয়াজ : মঞ্জুর ?

সবাই একত্রে : মঞ্জুর। (ইমাম সাহেবও ঝুঁকিয়া দস্তখত করিলেন)

তবাররুক : এবার তাহলে আমাদের কাজ শুরু হোক। আমি বেগম খোশবু আহাম্মদ সাহেবাকে তাঁর শের পড়বার জন্যে আহ্বান করছি।

(এক টুকরো নীল কাগজ হাতে লইয়া খোশবু আহাম্মদ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

খোশবু : (শাড়ির ভাঁজগুলির উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া) কবিতার নাম "লজ্জা"

"উহ্! কত আলো !
এত আলো আর তার রেখাগুলো
এতই প্রখর ?
আমার ইষদচ্ছ চর্মে যেন
বিঁধিছে বারবার
এত আঁধার তবু
উহ! কত আলো !
তোমার রক্তিম ঠোঁট
ঐ আঁধারে চমকিছে বারবার
দেহে এলো শিহরণ।
আমার নগ্ন শিহরণ যদিই-বা
তোমার চোখে পড়ে ধরা
তাই বলে কি লজ্জা দেবে আমায়
হাসবে তখন ?
ইস—তাহলে যে আমি
লাজেই মরে যাব।"

(কনে আঙুল ঠোঁটে ঠেকাইয়া উষ্ণমুখ নত করিয়া বেগম খোশবু আহাম্মদ সাহেবা থামিলেন)

খান্নাস, রকিব } (একত্রে)। বাহ্ওয়া-বাহ্ওয়া!

জায়গিরদার : বাগীশ্বরী! (বিভোর চিত্তে)

তবাররুক : বহুৎ আচ্ছা।

ফৈয়াজ : Eres maleque da qui! (অন্য ভাষায় বলিলে সকলে বুঝিয়া ফেলিবে এই জন্য তিনি ল্যাটিনে নিজেব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন)

খান্নাস : জায়গিরদার সাহেব, ও জায়গিরদার সাহেব (কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার তখন চক্ষু বন্ধ করিয়া গভীর নিশ্বাস টানিতেছেন) শুনছেন ? জায়গিরদার সাহেব, এই করছেন কি আপনি, কী শুঁকছেন ?

জায়গিরদার : এ্যাঁ, আমায় কিছু বলছেন ?

খান্নাস : হাঁ হাঁ, কী করছিলেন আপনি চোখ বন্ধ করে ?

জায়গিরদার : ও! ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের আঘ্রান পাচ্ছিলাম ঐ খোশবু আহাম্মদ সাহেবার কবিতায়।

(চোখ বন্ধ করিয়া আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। খান্নাস সাহেব ভেংচি কাটিলেন)

তবাররুক : জায়গিরদার সাহেব, আপনার শের পড়ুন।

জায়গিরদার : আমার আজকের কবিতার নাম "তিরশ্চুম্বক"। কবিতাটি অবচেতন মনের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের বিবর্ধিত বিবৃতি।

"কোথা সেই পিকাসোর অতিকায় কিন্নরী
তার কিম্ভুতকিমাকার রম্ভোরার কুঞ্চণ ?
কোথা সেই অভিন্নু অবূঢ়োব
নৈংগিক ক্রন্দন ?
মরুভূঁর স্বর্ণজলে শুধু ব্যর্থতার গ্লানি !
মোদের চিত্ত ভিন্ন মনা।
ছিন্ন করি চশমা সাবেক
তীক্ষ্ণমুখি স্ফুরণে, বল্গাহীন জেব্রা-বেগে-
কুঞ্চিত মাংসপেশি ঋজু করি আনি
মাগে শুধু মহালক্ষ্মী—সিন্ধের অন্তরালে
শুধু মরণেরে।
মুর্ছিত স্বরসংগিত।
অবলোহিত স্থৈতিক-মোক্ষণে
মিশ্রিত হলো সান্দ্র-স্বর্ণজলে
রহিল শুধু নিরুদ্বেগ তিরুশ্চুম্বকতা।'

শর্মিলা
সভর্তৃকা } আহ্— কী-ই-ই

খোশবু : (প্রশংসার আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখের পাপড়ি ঝুলিয়া পড়িল।)

খান্নাস : ভাষাটা একটু কর্কশ, একটু রূঢ় তা নইলে কবিতার বিষয়বস্তু অতীব পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

শর্মিলা : আমার মনে হয় বিষয়বস্তু ছাড়া আর সবই বেশ সুন্দর হয়েছে। (পজ্)

তবাররুক : এবার আপনাদের খ্যাতনামা কবি খোরশান রকিব সাহেব তার একটা কবিতা পড়ে শোনাবেন।

রকিব : আমি, আ-আ-মি ? আজ..জকে ?

শর্মিলা : (খুশিতে চলকাইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি-ই!

খোশবু : শমি!

(শর্মিলা সচেতন হয় এবং এক ধমকে নিজের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া ফেলে। রকিব সাহেব উদাসীনভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মনে মনে সমিতির প্রত্যেক সভ্যই একটা মহত্তর কিছু শুনিবাব আশায় উন্মুখ হইয়া ওঠে। রকিব সাহেব আরো কিছুক্ষণ চুপ করিযা থাকিয়া আরম্ভ করিলেন)

রকিব : কিন্তু আমি তো কোনো কবিতা আজ আনিনি।

(শর্মিলার সর্বপ্রথম দীর্ঘশ্বাসের সাথে সাথে আর প্রত্যেকেই একটু আধ্টু দুঃখজনক শব্দ উচ্চারণ করিল)

তবাররুক : তা, শামল। বেগম তাহলে আপনিই একটা কবিতা পড়ুন।

শর্মিলা : আচ্ছা পড়ি। (শাড়ির কোনো গুপ্ত ভাঁজ হইতে এক টুকরো কাগজ হাতে লইল। কিন্তু ইনানো-বিনানো মিহি-গলায় এত বেশি দরদ দিয়া তিনি সেটা আবৃত্তি করিলেন যে, কেহই তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।)

রকিব : আপনার কবিতাটা কি একবার দেখতে পারি শর্মিলা সাহেবা ?

শর্মিলা : (ঠোঁট ফুলাইয়া) আমার রিডিং পড়াটা কি এতই খারাপ যে আপনি তার এক বিন্দুও...

রকিব : (নার্ভাস হইয়া তাড়াতাড়ি) না না সে কথা নয়। আপনার কবিতা খুব ভাল হয়েছে তাই তো নিতে চাইছি। আমার "স্যাংগাৎ" পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে চাইছি। (হাতে নিল)

খান্নাস, ফৈয়াজ : বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে কবিতাটা।

তবাররুক : এবার মোনায়েম খান্নাস সাহেব আপনার কবিতা—

খান্নাস : আমার কবিতায় খুব দর্শনবাদ থাকে বলে অনেকেই আমায় দোষ দিয়ে থাকেন। তাই আজকের এই কবিতায় আমি যথাসম্ভব দর্শনবাদ বাদ দিয়ে কবিতার মূল শিল্পকলাকেই—

ফৈয়াজ, কিয়াওমিদ্দিন : আহ্হা ? তাকাল্লুছের কী আছে ? আপনি আদত কবিতাটাই শুরু করুন না।

খান্নাস : (দুইজনের প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া) কবিতার নাম "জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরে"।

"অনেক ভাগ্য বাতাসে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক আশা মনেতে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক নারী মিছিলে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক বাঁশি ঘাটেতে ছিল— আমার কপালে ছিল না
আমার কপালে ছিল না বন্ধু আমার কপালে ছিল না
জীবন দেবতা আমারে শুধু করিল প্রবঞ্চনা।
আমার আসার আমলে শুধু জন্ম বিধাতা হাসিল না
সুফলা সখীরা আমারি তরে প্রোটোপ্লাজম আনিল না
বাতাসে কখনও ভাগ্য ছিল না— কপালে আমার ছিল
মনেতে কখনও আশা ছিল না— কপালে আমার ছিল
মিছিলে কখনো নারী ছিল না— কপালে আমার ছিল
ঘাটেতে কখনো বাঁশী ছিল না— কপালে আমার ছিল
কপাল আমার ছিল হে বন্ধু, ছিল আমার কপালে
প্রোটোপ্লাজমের মৃত আত্মা, যেন আধারের মেলে।

শর্মিলা : (ওনার কপাল দেখাইয়া) কিন্তু আপনার কপালে ওটা কী হলো ?

জায়গিরদাব : তাইতো, আপনার কপাল অত ফুলো কেন ?

খান্নাস : (চটিয়া) This is no criticism। ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি পরবর্তী কবিতা পড়িতে অনুরোধ করা হোক।

তবাবরুক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশি সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। (সময় নষ্টেব কথায় প্রত্যেকে একবাব তবাররুক সাহেবের দিকে চাহিল এবং বিবর্ণ হইয়া গেল)

আঁন্‌হ,-কুমারী সভর্তৃকা গুহ দেবী। আপনি আপনার কবিতা পাঠ করুন।

সভর্তৃকা : (স্লিং-এ বাঁধা হাতটা ঠিক করে এবং মালী খোরশান সাহেবের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া) কবিতার নাম "এখনি কি যাব চলে?"

মিলনের শেষে শুধু বলেছিলে
'এখনই যাইব আমি'
হৃদয়ে যে সুর উঠেছিল জাগি
চমকি গেল তা থামি।
অঙ্গে ছিল যে চমক সরস
অতি শীঘ্র হলো নিরস বিরস
বিদায়ের ক্ষণে বলেছিনু কেঁদে
'শুধু তুমি এস

ভার্সিটি যদিও ভুলে যায় মোরে
তুমি মোরে ভালবেসো'।
করিডোরে ক্লাসে ভেবেছ কি সেই কথা ?
কভু ভুলে যাও নাই ট্যুটরিল খাতা ?
তোমার চশমার গোলাকার আকার
শুধু মোর মনে আছে
সে চাহনি মনের খোলসে রাত
ব্যাকুলতা আনিয়াছে।
'এখনি যাইব' বলেছিলে তুমি, জানি
ভুলিয়া যাইব সেই কর্কশ বাণী

ফৈয়াজ : Da Quinna, Da Villiaina, Da Cinna (ল্যাটিন)

রকিব : আমার পত্রিকার জন্যে কবিতাটা দেবেন কি ? (নেয়)

(অন্য সবাই এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশংসার হাসি হাসিল কিন্তু তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের দিকে চোখ পড়িতেই আবার ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছিল)

তবাররুক : মোকাব্বের মালী খোরশান সাহেব!

ফৈয়াজ : (কঞ্চি বাঁশের মতো বাঁকা হইয়া) কবিতার ডেফিনেশন দিতে গিয়ে T. S. Eliot একবার বলেছিলেন—

খান্নাস জোয়ারদার : হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিয়া) তাকাল্লুছের কী আছে, আপনি আদত জিনিসটাই শুরু করুন।'

ফৈয়াজ : (বক্তৃতায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষ মর্মাহত) কবিতার নাম "এখনি কি চলে যাব?"

বর্ণের জৌলুস চলিয়া গেছে
চর্মের জ্যোতি তাও আর নেই
কাহিল নওজোয়ানের প্রান্তে এসেছে উচ্ছ্বাস।
এ উচ্ছ্বাসে শ্বাস নাই হাসিছে কঙ্কাল
সম্মুখে নতুন গলিতে দিতেছে হাতছানি
পশ্চাতে স্মৃতির তবু অস্থির টানাটানি।
মহবৎ গুম্বুজ চূড়ায় মোর জমেছে কুহেলিকা
ভবিষ্যের আকাঙ্ক্ষায় তব কে টানিবে রেখা ?
এখনই কি নেব বিদায় ?
যদি কভু সত্যই যাই চলে
রুদ্ধ বারি অতৃপ্ত দিলের খায়েশ
ত্যাজিয়া তোমার লেবাসের উষ্ণ-ঘন খোশবু আবেশ।
সব বিস্মৃতি তলে আরো ডুবে যায়

ক্ষীণ স্বার্থ অহেতু অন্যায়।
স্যান্ডেল তলে জেগেছিল করিডোরে
সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভরে
অগণিত বক্ষনিচোল উঠেছিল ফুটে
মানস নয়নে মোর জেগেছিল কামনার শিখা
আজ শুধু সেরেফ নিঃসাড় ক্লান্তি
এই দুনিয়ায়—
সত্য শুধু বর্তমান, হোক না তা নির্জীব মুর্ছিত
তব চুচুকের শ্লথ শ্লথ গ্রথিত
নির্বাসিত বিমুগ্ধ, রশ্মির মতো,
যে আল্পনা আঁকিলাম
রক্ত আখরে তীক্ষ্ণ নগরে
তপ্ত ঐ দৃপ্ত উরষে
তাই যেন ভুলে যেও ভবিষ্যের ডাকে
ছিন্ন করি স্মরণের জীর্ণ গ্রন্থিগুলি
ব্যঙ্গ করো, করো জন্মরহস্যে পরম নির্ভয়ে।
প্রিয়ারে ডাকিয়া কহো;
আজ থাক বেদনার ক্রন্দন
প্রিয়তম দূরে চলে গিয়া কেন চশমার অঙ্গন!
এখনি কি যাব চলে ?
যদি কভু সত্যই...(থামিয়া বসিলেন)

(এতক্ষণে আতঙ্ক সব্বাইকে পূর্ণোদ্যমে চাপিয়া বসিয়াছে। সব্বাই প্রত্যেকে বুঝিল যে ইহার পর আর ত্রাণ নাই। আকাশে বাতাসে প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা।)

(শর্মিলার চোখে ক্রুদ্ধ ফণিনীর হিম আভা। সে দুই হাতে, কী একটা লইয়া কানের কাছে তুলিল)

খোশবু : (চাপা গলায়) কী ওটা, কী করছিস ?

শর্মিলা : কানে তুলো পুরে রাখলাম। ঘড়ি দেখে দেড়ঘণ্টা পর খুলে ফেলব। যদি তখন ওর গলা শুনতে পাই তাহলে, তাহলে...

(হাঁপাইতে থাকে)

(পেছনের বড় ঘড়িটায় ঢন করিয়া সাড়ে আটটা বাজিল)

তবাররুক : (বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে) এবার তাহলে আমার পালা না ? আরম্ভ করি ?

(বিরাট নিস্তব্ধতা)

তবাররুক : কবিতার নাম :"চৌরংগী-নামা"

(স্তব্ধতা)

"সওদাগর ! মরু সাইমুম
প্রবল আঘাত বাধায়
হোয়াইটওয়ের পুরু কাচে
নিথর মৃত্যু ভয়ঙ্কর
আমিন আমিন রবে
নেচে ওঠে অজন্তার ছাঁদে!
অভিশপ্ত শকুনেরা
রোলস্‌রয়েসে বসে
তায়েফের পথে বাড়ায় পা
রাত্রি ঘনালো তিমির অতলে
আওলাদ সশব্দ ওঠে কাঁদি
ফুকারী মা-মা!

(অস্পষ্ট গুনগুম আবৃত্তির সাথে সাথে আস্তে আস্তে আলো একদম নিভিয়া যাইবে এবং ক্রমশ স্পষ্টতরো আবৃত্তির সাথে আবার স্টেজ আলোকময় হইতে থাকিবে।

তখন দেখা গেল সাড়ে দশটা বাজে। সভ্য-সভ্যাদের চুল অবিন্যস্ত বেশভূষা বিপর্যস্ত, চোখে ক্লান্তি, কপালে ঘাম, অঙ্গে শৈথিল্য— তবু ও)

"শুদ্ধধার সওদাগর জাগো জাগো!
আজরাইলের কণ্ঠস্বর এখনো কি
কলিজায় তব—

(শর্মিলা তার কানের তুলা খুলিতেছে এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত আকাশ চিরিয়া একটা তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। ইমাম ব্যতীত অন্য সকলেই হকচকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে..কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত, অদম্য আগ্রহে)

"কলিজায় তব খুন এখনো কি
অবরুদ্ধ বেদনায় ডাকে নাই বানচাল ?
লাম্পট্যের বাহকেরা, জঘন্য বিধ্বংস মানুষের
দোস্ত যাঁরা—
তাহাদের শির কতল কর, কতল কর
ছড়াও হলাহল,
হে বিরাট যুদ্ধ জাহাজ
হে সওদাগর!

(সমিতির সভ্য-সভ্যারা তখন কেহ টেবিলের নিচে, ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়া কাঁপিতেছে— তবু ও)

"আমার বাণীর বেহেশ্‌তী রোশনাই
বিস্তারিবে সারা দুনিয়া।

খোঁড়া তৈমুর মৃত হায়দার
জাগিবে আবার,
হে চৌরঙ্গীর সওদাগর
লিপস্টিক ঠোঁটে সন্ধ্যাগমে
যে হুরীর দল...

(বুমবুম করিয়া অতি নিকটেই কোথায় বোমা পড়িল। ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। "হুড়মুড়" করিয়া ছাদের এক অংশ ভাঙিয়া পড়িল। কয়েকটা স্প্লিন্টার এদিক-সেদিকে বিক্ষিপ্ত গতিতে ছুটিয়া গেল। বেশ কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।

অন্ধকারে ভগ্ন স্তূপের একটা অংশ একটু নড়িয়া উঠিল। স্তূপিকৃত বিধ্বস্ত ইট-পাটকেলের মধ্য হইতে একটা হাত নড়ে, তাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ যার আলো একটা বিরাট খাতার উপর ফেলা, আর তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের মুখ তাহার ওপর ঝুঁকিয়া- এবং সাথে সাথেই পুনর্বার পূর্ণোদ্যমে)

"লিপিস্টিক ঠোঁটে সন্ধ্যাগমে
যে হুরীর দল
গোরা সৈন্য সকল
বাসরে ইঙ্গিতে দোলে
ইস্পিত দিল যেখানে
খোদার আরশচ্যুত হোলে..

শর্মিলা : (ভগ্নস্তূপের অন্য পাশ হইতে) না, না— এ অসহ্য, বন্ধ করুন!

(এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছয় ইঞ্চি ইট উড়িয়া আসিয়া টর্চটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল—তবুও সেই অন্ধকার হইতে তবাবরুক আহাম্মদ সাহেবের ননস্টপেবল নাটকীয় আবৃত্তির আধুনিক পুঁথিসুর শোনা যাইতেছিল...)

তবাররুক : "ওলো লজ্জাবতী ও...লো হুর!
হাঁকে খান্নাস খবিস দল
হাঁকে জান্নাতবাসী গেলমানদল
করি— সুর—
ওলো লজ্জাবতী ও-লো হুর।

(দূরে বোমা পড়ে বুমবুম)

কাফেরের খুনি
কঠোর করাঙুলি ঘাতে ওড়ে

[ধীরে ধীরে পর্দা নামে]

[যবনিকা]

** ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ১৯৪৩ সনের বর্ষসমাপ্তি অধিবেশনে পঠিত*

সংঘাত

চরিত্র

কবি

তরুণ

ঠাকুর

[খ্যাতনামা অথচ ইদানীং বিলীয়মান কবি— কোনো এক ভোরে তাঁর নিজের ঘরে বসিয়া কী একটা লিখিতেছিলেন। টেবিলের ওপর একটি কাচের গ্লাসে জল। এমন সময়ে ঝড়ের বেগে এক অচেনা তরুণের প্রবেশ।]

কবি : কী চাই ? ওহ্! বুঝেছি, বাণী নিতে এসেছ বোধহয়। [কাগজ কলম হাতে নিয়া] কিন্তু দেখো ওসব দেবার মতো সময় আমার হাতে—

তরুণ : আজ্ঞে বাণী নয়। আপাতত এক গ্লাস পানি মানে জল হলেই চলবে। নিচে একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে একটু জল জল বলে কাঁদছে কিনা!

[জলের গ্লাসসহ প্রস্থান]

কবি : [অপ্রস্তুতভাবে ফ্যালফ্যাল নেত্রে] বেশ তো ছন্দ তৈরি করলো ছেলেটা ! বাণী-পানি! [খাতা খুলিয়া লিখিয়া রাখেন]

তরুণ : [প্রবেশ] ধন্যবাদ, এই আপনার গ্লাস।

কবি : মানে ওটা তুমি ঐ রাস্তার গেঁয়ো ম্লেচ্ছটাকে ছুঁতে দিলে ? আমার গ্লাস ?

তরুণ : তাই কি পারি নাকি— ও রকম গ্লাস দিয়ে জল খেতে হলে ও হয়তো ওর হাত-পা-ই কেটে ফেলত— অভ্যাস নেই কিনা ?

কবি : আচ্ছা বসো। তা কী করা হয় ? ঐ সবই নাকি ?

তরুণ : আজ্ঞে ভদ্র সমাজ থেকে চ্যুত না হয়ে পড়ি সেই ভয়েই আজকাল জড়োসড়ো। করব আর কী ? তবে ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার জন্যে যত রকম অভদ্র কাজ করা দরকার সেসব কিছুই আজকাল অল্প বিস্তর চেষ্টা করছি।

কবি : আর কী কর ?

তরুণ : জ্যান্ত মানুষদের নাচিয়ে তুলি আর মরা মানুষদের পুড়িয়ে ফেলি।

কবি : কথার ছাঁদে বড় ছন্দ দেখা যাচ্ছে যে— সাহিত্য কর নাকি ?

তরুণ : বড় লজ্জা দিলেন— মাঝে মাঝে একটু আধটু কবিতা লিখি।

কবি : [লাফাইয়া] অ্যাঁ— কবিতা লেখ। তুমি ? বয়স কত ?

তরুণ : আমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ— তবে কবিতা লিখছি জন্মের কিছু পর থেকে, এই বছর দশেক ধরে।

কবি : ওই ! নব্য কবি, তুমি নব্য কবি, নাঃ!

তরুণ : আহাহা দেখুন, দেখুন, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, আপনার বয়সে ওটা খুব মঙ্গলজনক চিহ্ন নয়!

কবি : [মুখ বিকৃত করে] অ্যাওহ্! আজ পেয়েছি তোমাকে একজন। দেশের

সাহিত্যের কী করুণ অবস্থা আজ! কোথায় কবিতার বিষয়বস্তু হবে লীলাপদ্ম লোধ্ররেণু, তা নয়, তোমরা কিনা ছেঁড়া ঘা আর চুলোর ছাই নিয়ে আরম্ভ করলে কাব্যচর্চা!—

তরুণ : যার ভাগ্যে যা বুঝলেন না। আমাদের হয়েছে ভীষণ মুশকিল্। মুদ্রার অভাবে যত রকম মুদ্রাদোষ ছিল সব একটা একটা করে উঠে গেল। কিন্তু আপনারা হলেন গুণী, তাইতো সত্তোর বছর বয়সেও যে সব কবিতা আর প্রবন্ধ লিখছেন সে সব রীতিমতো উত্তেজক।

কবি : তুমি কি নিয়ে কবিতা লেখ ?

তরুণ : বছর আটেক আগে প্রাকৃতিক বিষয়ক খুব লিখতাম। তারপর কলেজ জীবনে করিডোরে যা দু'এক টুকরো জর্জেট রেণু নজরে পড়ত, তারই উপর চালিয়ে দিতাম মন্দাক্রান্তা ছন্দের রোলার। আজকাল অবশ্য মানুষ নিয়ে।

কবি : থামলে কেন ? আজকাল বুঝি ফ্যান আর ডাষ্টবিন নিয়ে খুব ফ্যাৎরামো চলছে ?

তরুণ : কী আর করি! চশমার কাচ এত পুরু হয়ে এল যে মনশ্চক্ষু নিয়ে লোধ্ররেণু নাড়াচাড়া করার সুযোগই আর পেলাম না। আপনারা হলেন ক্ষমতাবান পুরুষ, আপনাদের কথা আলাদা।

কবি : ওহ্! রুচির কী অধোগতি ! জানো কবি এমনি হাওয়া যায় না। খাস আর্যরক্ত বওয়া চাই নীল ধমনীর মধ্য দিয়ে, গৌরকান্তি, নধর দেহ,—

তরুণ : হাঁ হাঁ তা নইলে কী চলে ? আর আজকাল আমরা যেন সব মর্কটাকৃতি। কবিতা লিখতে গেলে চেহারাই তো আসল, না ?

কবি : আর দেখো এই অজিত সেন-কে। বছর কয়েক আগেও ছোকরা বেশ লিখত। আমি নিজে ওর ওপর প্রবন্ধ লিখেছি।

তরুণ : সে আপনার করুণা।

কবি : আর সে-ই কিনা সেদিন কবিতা লিখল 'ফ্যান' নিয়ে।

তরুণ : দেখুন তো কী অন্যায়। ফ্যান খেয়ে একটা মানুষ মরার হাত থেকে বাঁচতে পারে, তাই বলে কি তার ওপর একটা কবিতা লেখা চলে ?

কবি : তাও কী! গদ্য কবিতায়। বাহা রে গদ্য, তার আবার কবিতা ?

তরুণ : হ্যাঁ ঠিক যেন ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল, না ? আসলে হচ্ছে কী, অজিত সেনটা ভীষণ আলসে। আরে একটা মানুষ ফ্যান চেয়ে কাঁদছে, অমন কাতরানির সুরটাকে তুই যদি কষ্ট করে রতিবিলাস ছন্দে না বলতে পারলি তা হলে তুই কবি হবি কী করে— আপনারা তাকে কবি বলবেন কেন ?

কবি : জান, আমার মনে হয় ঐ অজিত সেন এতদিন পড়াশুনার জন্যে পারীর কোনো বুলোভের্দায় থাকত, ওর লেখায় একটা সুস্পষ্ট বর্দলেয়ারি সুর

বর্তমান থাকত। তারপরও বুঝি সব ধনী আধুনিক ছোকরার মতোই ঘুরতে গেল রুশিয়া দেশে— ব্যাস ওখান থেকে ঘুরে এসেই ছোকরার মাথাও একদম বিগ্‌ড়ে গেছে।

তরুণ : থামুন থামুন। অত বিরাট একটা থিওরি দিলেন যে, হজম করেনি। অজিত সেনের বাড়ি তো জিঞ্জিরা।

কবি : এ্যাঁ।

তরুণ : আর ওর অবসর সময়ের দৌড় ড্যামরা অবধি।

কবি : [চিৎকার] ড্যামরা। আর ওকে আমি বলেছিলাম কিনা কবি। পূর্ববঙ্গে ড্যামরা একটা গ্রাম—গণ্ড গ্রাম—আহা, সে যে অনার্য্য।

তরুণ : একটা সুসভ্য বর্বর। আপনাদের সভ্যতার অপভ্রংশ! নয় কি ?

কবি : কিন্তু তুমি কী করে তাকে চিনলে ?

তরুণ : লোকটা নিছক বলে! আচ্ছা আমি এখন আসি।

কবি : কোথায় ?

তরুণ : একটা মিলের মিটিং।

কবি : [নাক সিঁটকাইয়া] ওহ্! তুমি তো কবি এবং কর্মীও, চটি জুতোর আবার ফিতে। কিন্তু হ্যাঁ বাণী-টানির দরকার হলে চেয়ে নিও।

তরুণ : ধন্যবাদ। আগে ওদের বর্ণ-পরিচয় ঘটিয়ে দি, তারপর নেব।

[দরজার পথে পা বাড়ায়।]

কবি : এই—একটা কথা, তোমার নামটা বললে না ?

তরুণ : ধন্যবাদ, এত পরে তবু যাহোক নামটা জানতে চাইলেন। নাম অজিত সেন।

[প্রস্থান]

কবি : এ্যাঁ অজিত সেন! আপনি— আ— আ, আপনি। যাকগে, কবিতা আজ আমিও একটা লিখব— অজন্তার চিত্রকৌশল আঁকবো আজ ছন্দের মধ্য দিয়ে। চাই একটুখানি নীরবতা। ধ্যাৎ, বাইরে আবার ওটা কী চেঁচাচ্ছে! [জানালায় উঠিয়া দেখেন, দুই কানে হাত] কী চাইছে, ফ্যান, নাঃ মেজাজটা দিল খিঁচড়ে—। বয়, বয়, [চাকর আসে] চা লে আও।

ঠাকুর : হুজুর, কয়লা লাকড়ি কিছু নেই যে। বাজারে টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না।

কবি : নাও আমার এইসব রচনা [কয়েকটা বই হাতে নিয়া]— আমার কাব্য ইতিহাস। তাই জ্বালিয়ে চা কর। আমি আজ আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখব— কালিদাসকে ফিরিয়ে আনব।

ঠাকুর : হুজুর, চিনিও নেই।

কবি : চিনিও নেই— ওহ্! Get out you fool! [চাকর প্রস্থান করার পর কলম

হাতে নেন] তবু আমি লিখব,— আমার মেঘদূত [লিখতে যান এবং দেখেন কালি নাই] কালি নাই ? ওহ্! তুমিও নাই ? এখন আমি কী নিয়ে কবিতা লিখব, কী দিয়ে লিখব ! [জানালা বন্ধ করে] আহ্! চেঁচাস না থাম সব! নচ্ছার অজিত সেন, কিন্তু কী ছন্দে লিখব ? মন্দাক্রান্তা, অমিত্রাক্ষর ?

[যবনিকা]

গুণ্ডা

চরিত্র

আনোয়ারা বা আনু

আকাশ

গুণ্ডা

নানি

আলম

(বিছানার ওপর মশারি ওঠানো। মাথার কাছের টিপয়ের ওপর নীল শেড দেয়া একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আর বিছানার ওপর শুয়ে একটি মেয়ে। মাথার নিচে তিনটে বালিশকে যতখানি সম্ভব উঁচু করে তাতে মাথা হেলান দেয়া। বুকের ওপর দু'হাতে দাঁড় করানো একটা মোটা খোলা বই। আলো বইয়ে পড়ছে বেশি, মুখে অল্প। গায়ের ওপর বাদামি রঙের একটা পাতলা কাশ্মিরী শাল আলতো করে টেনে দেয়া। দীর্ঘ দেহের ভাঁজে ভাঁজে মসৃণ শালটা কেমন যেন জীবন্ত আগ্রহে নিবিড়ভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে আনোয়ারা খানমকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্লাসের ছাত্রী আনোয়ারা খানম। মুখে সবসময় একটা জোনাক-জ্বলা হাসি। অকৃপণ কিন্তু সংযত। সেটা সকলকেই খুশি করে চলে কিন্তু কাউকে উৎসাহিত করতে চায় না। সুঠাম স্বাস্থ্যে এমন একটা স্থায়ী সুর জমেছে যে এখন সেটা সম্বন্ধে স্থান-পাত্র নির্বিশেষে নির্বিবাদে উদ্দেশ্যহীন ঔদাসিন্য প্রকাশ করে আনু আপা চলতে পারে। বিশেষ করে যখন গায়ের রং জীবন্ত-সাদা আর ধারালো চিবুকের সুগঠনে রয়েছে একটা ব্যক্তিত্বের ঝাঁঝ।

ঘরের আসবাবপত্র প্রয়োজনীয় এবং পরিচ্ছন্ন। রুচি বিকৃতির এতটুকু বাহুল্য নেই। ঘরের পেছন দিকে একটা গরাদহীন বড় জানালা। তার ওপরের অংশ খোলা। নীল পর্দা উড়ছে তাতে।

আনু আপা পড়ছে।

হঠাৎ একঝলক হাসি আর হুল্লোড় দুদ্দাড় শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মুখ থুবড়ে এসে পড়ল আনু আপার ভেজানো দরজায়। হুড়মুড় করে দলা পাকিয়ে ঘরে এসে ছিটকে পড়লো তিনটি মেয়ে।

তার মধ্যে প্রচুর স্বাস্থ্যে ঠাঁসবুনোট, অত্যন্ত শক্ত লম্বা একটি মেয়ে হাসির গমকে গমকে ফেটে পড়ছে। বেসামাল হয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। আর অবরুদ্ধ হাসির বিস্ফোরণকে রুখবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজের হাঁটুই কামড়াচ্ছে লালাক্ত আবেগে।

হোস্টেলের সবাই মেয়েটিকে ডাকে গুণ্ডা বলে। চশমা পরা বেঁটে মতন মেয়েটি কোমরে হাত দিয়ে ভ্রু কুঁচকে গুণ্ডাকে লক্ষ করছে।

হোস্টেলে ডাক নাম এর নানি।

আর মাঝারি গড়নের কোঁকড়া চুলো হাল্কা মেয়েটি ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধের ব্লাউজের নিচের একটা অংশ টিপতে টিপতে ঘুমন্ত চোখ দুটোকে ব্যথিত করে, আনু আপার মাথার কাছে গিয়ে ছুটে দাঁড়াল। একে সবাই নাম দিয়েছে আকাশ।

আনু আপা বই রেখে দিল। বুকের ওপর চৌকো করে দু'হাত জড়িয়ে

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রথমে নানি, তারপর গুণ্ডা, তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলল।)

আকাশ : ঐ গুণ্ডা, গুণ্ডা কামড়ে দিয়েছে।

নানি : (গুণ্ডাকে) আর কতক্ষণ ও-রকম অসভ্যতা চলবে ? আরো খানিকক্ষণ চিবুলে শাড়ি কেন তোর হাঁটু শুদ্ধো ছিলে যাবে।

(হাসি থামিয়ে গুণ্ডা নানিকে দেখে)

আকাশ : ঠাট্টা নয় আনু আপা, এই দেখ না, কামড় দিয়ে একেবারে গোস্ত উঠিয়ে ফেলেছে। গুণ্ডা!

আনু : ইস্ তাইতো, কতখানি জায়গা কী লাল হয়ে গেছে। হ্যাঁরে গুণ্ডা তোর স্বভাবটা, ঐ বদ স্বভাবটা বদলাতে পারিস না ? সভ্যসমাজে তোকে যখন চলতেই হবে তখন ওটাকে বদলে ফেলাই ভালো, কী বলিস ? কবে কাকে কামড়ে বসে কী বিপদ ঘটাস কে জানে!

গুণ্ডা : না আপা ও আমি বদলাতে পারব না। যার না সয় সে দূরে থাকুক। যখন তখন ফিক করে ঠোঁটের কোণে দাঁত-চাপা মেয়েলি হাসি, কী কৃত্রিম আব ন্যাকা— এসব আমার হয় না। হাসি আমার পায় না। যখন সাবা শবীরে হাসি ফুলে ওঠে, দাঁতের গোড়া অবধি সুড়সুড় করে ওঠে— তখন কিছু না কামড়ালে আমার হাত পা ঝিমঝিম করে।

নানি : তাই বলে তুই যাকে পাবি, তাকেই কামড়াবি ?

আকাশ : যা মুখে ঠেকে তাই ?

গুণ্ডা : তাইই—সজ্ঞানে তো আর কামড়াই না! লজ্জা কীসের, ভয়ই-বা কীসেব ?

আনু : এমনকি রাত কি দিন তারও কোনো বাছ-বিচার না করে। তা না হয় বুঝলাম কিন্তু রাতদুপুরে সে বিস্ফোরণটা হঠাৎ আমার ঘর লক্ষ্য করেই উৎক্ষিপ্ত হলো কেন ?

(গুণ্ডা একঝলক হাসে)

আকাশ : মাগো! আনু আপা ঐ দেখ গুণ্ডা আবার হাসতে শুরু করল বলে।

গুণ্ডা : (মুখে কাপড় গুঁজে) না এই বন্ধ করলাম।

নানি : হাসতে হয় হাসো, কিন্তু ঐখানে বসে। আজ থেকে তোমার হাসতে ইচ্ছে হলে মাঠে গিয়ে হাসবে, লোকালয় থেকে দূরে— কারো গায়ে ঘেঁসে বসে তুমি কক্ষণো হাসতে পারবে না।

আনু : কিন্তু রাতদুপুরে তোমার আজ এত হাসি উথলে উথলে উঠছে কেন ? কোনো কারণ আছে না এমনি কাউকে কামড়াবে বলে ?

(গুণ্ডা আচমকা আনু আপার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলে)

আকাশ : মিথ্যে কথা, বিশ্বেস করো না, আনু আপা, সব মিথ্যে কথা।

নানি : না, সব সত্যি কথা, অক্ষরে অক্ষরে।

আকাশ : আমি ও-সব কথা একটাও বলিনি।

আনু : কী বলেছিলে সেটা এখন বলে ফেললেই হয়।

আকাশ : আমি শুধু বলেছিলাম—

গুণ্ডা : হাঁ হাঁ বলো বলো।

আকাশ : বলেছিলাম আজ ক্লাসে আলম ভাই—

নানি : আলম ভাই নয়; তুমি বলেছিলে আলম সাহেব।

আকাশ : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বলেছিলাম, কিন্তু ওকী আনু আপা তুমি এমন করে আমার দিকে চাইছ কেন ? আমি— আমি খারাপ কিছুই বলিনি, জিজ্ঞেস কর ওদের ? আমি খারাপ কিচ্ছু বলিনি, আনু আপা।

আনু : সে-কথা কেউ বলেনি। যা বলছিলে বলতে থাক।

(হাসি থেকে অন্ধকার তখন নেমেছে— আনু আপার চোখে। মুখে একটা ঠাণ্ডা পাথুরে নিশ্চলতা। এক দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে চোখ মেলে। গুণ্ডা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে আনু আপার মুখের পরিবর্তনের রেখাগুলো। নানি নিরীক্ষণ করছে উভয়কে— অবাক হয়ে)

আকাশ : আমি শুধু বলেছিলাম বিস্কিট রঙের সুটের বুকে ঘন নীল সার্টের ওপর লাল টাই চমৎকার মানিয়েছিল!

গুণ্ডা : সত্যি ? আলম ভাই নিজ কানে শুনলে তোকে নিশ্চয়ই—

আকাশ : যা তা ঠাট্টা করো না। আনু আপা তুমিই বল দোষ করেছি কিছু ? তুমি আজ আলম সাহেবকে দেখনি, দেখলে তুমিও—

নানি : বোকার মতো কথা বলিস না আকাশ। আলম সাহেবকে আনু আপা আজও দেখেছে। এবং তোর চেয়ে ভাল করেই। তোর সঙ্গে নয় আলম সাহেব পড়ে আনু আপার সঙ্গে, একই ক্লাশে বুঝলি ?

আকাশ : ও ? তাই তাইতো !

নানি : কামড়ে কামড়ে আনু আপার চাদর ছিঁড়ে ফেলবি নাকি, গুণ্ডা ?

গুণ্ডা : আর কিছু বলনি ? (কোনো রকমে হাসি চেপে)

আকাশ : আর আর শুধু বলেছিলাম হঠাৎ দেখতে একেবারে ঠিক তোমার মতোই—

গুণ্ডা : আর ঠিক যেমন করে যখন তখন চুমু দিয়ে তুমি আমায় আদর করো; ঠিক তেমনি করে—

আকাশ : মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা আমি ওসব কক্ষণো বলিনি। ও-সব ওর বানানো আনু আপা—

আনু : আহ্ চিৎকার কর না আকাশ। গুণ্ডা হাসি থামা, হাসি বন্ধ কর।

(এক ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দেয় গুণ্ডাকে। আকাশ ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে যায়)

গুণ্ডা : এখনই কী— মজার কথাটাই তো এখনো শুনলে না। বলে দেব আকাশ ?

আকাশ : আবার কী বলেছি ?

গুণ্ডা : আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেছ— তাহলে কী হবে গুণ্ডা আলম সাহেবকে ভোট আমি দিতে পারব না।

নানি : সত্যি ?

গুণ্ডা : আমিও খুব গম্ভীর হয়ে বললাম— বেশ তো মনে না ধরে, না দিবি। আমার বড় ভাই বলেই যে তাকে ভোট দিতে হবে তার তো কোনো অর্থ নেই।

আনু : এতে এমন হাসির কী হলো ?

নানি : (আগ্রহ) আকাশ কী বলল তারপর ?

গুণ্ডা : তারপর দু'চোখ পুকুর করে, তা থেকে চোখের পলক দিয়ে আঁজলা আঁজলা পানি ছিটিয়ে বলল : আমার তো দেবার ইচ্ছে ছিলই, কিন্তু , কিন্তু আনু আপা নিষেধ করেছে যে! আনু আপা নিষেধ কবেছে আলম ভাইকে-

(বলতে বলতে বুনোহাসির দমকা ঘূর্ণিতে কেঁপে উঠলো গুণ্ডা। এবার নানিও সংক্রামিত হয়ে ওঠে সে হাসিতে। আকাশ কুঁকড়ে আনু আপার গলা জড়িয়ে ধরে। আনু আপা গম্ভীর। গুণ্ডা একটু নিস্তরঙ্গ হযে এলে পর—)

আনু : তোমার মহৎ বড়ভাইকে ভোট দিতে নিষেধ করার মধ্যে এমন কী হাসির কারণ খুঁজে পেলে ?

নানি : তাহলে সত্যি তুমি নিষেধ করেছ আনু আপা ?

আনু : সত্যি নয়তো মিথ্যে নাকি ?

গুণ্ডা : (হঠাৎ শঙ্কিত) অর্থাৎ ?

আনু : বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ? তোমার দেবপ্রতিম, গুণধর, সুপুরুষ বড়ভাইকে মেয়েদের হোস্টেলে কেউ ভোট দিতে অস্বীকার করবে— একথা বিশ্বেস করতে মন চাইছে না, না ?

নানি : অন্যের কথা থাক। শুধু নিজের কথা বলো!

গুণ্ডা : কিন্তু আনুআপা তুমি ভোট না দিলে হোস্টেলের আর কেউ যে ভোট দেবে না।

আনু : কাল ভোরে সকলকে সে অনুরোধই করব।

নানি : আলম সাহেব হেরে যাবে যে !

আনু : আমাদের তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে না ?

নানি : অন্তত তোমার মনের ভাব তো পরশুও তেমনি ছিল।

আনু : মুখ সামলে কথা বল নানি।

গুণ্ডা : সামলাবে আবার কী ! আমাদের কচি খুকি পেয়েছ নাকি ? 'Romeo juliet' এর যেদিন ক্লাস থাকে সেদিন তুমি কেন বারবার ঐ নীল শাড়িটাই পড়ে যাও। সে-সব খবরও আমরা রাখি।

আকাশ : আনুআপ, এসব কী করছো ? তোমরা অমন করে ঝগড়া করছো কেন ? আমার দিকে অমন করে তুমি তাকিও না আনু আপা!

আনু : থাম আকাশ! (গুণ্ডাকে) তোমার বড়ভাই আর কার কার কোন রঙের শাড়ি পরা সম্বন্ধে কী কী অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও বলে ফেলো- সবাই আলো দেখুক!

গুণ্ডা : যা মুখে আসে তাই বলো না আনু আপা।

আনু : এত ভক্তি! তাও চরিত্র সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিনি।

নানি : না বললেও চলবে। দু'দিনের মধ্যে যার মনের রং দু'বার করে বদলায় অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে তার মতামত না শুনলেও আমাদের চলবে।

(আনোয়ারা খানম রাগে দাঁড়িয়ে পড়ে)

আকাশ : আনু আপা— আনু আপা—

আনু : তুমি কী বলতে চাও?

নানি : আরো সোজা করে বলব ? তোমার মনের— তোমার একান্ত নিজস্ব মনের একটা উত্তেজক মুহূর্তের খামখেয়ালি আমরা সকলে মেনে নাও নিতে পারি।

আনু : আমার নিষেধ সত্ত্বেও কাল তোমরা সকলে আলম সাহেবকে ভোট দিচ্ছ।

নানি : আর আমার বিশ্বেস অমন করে নিষেধ করতে যেয়ে সকলের কাছে তুমি নিজেকে হাস্যকর করে তুলবে না।

আনু : তোমার কাছ থেকে উপদেশ শোনার জন্য রাত জেগে থাকি না নানি!

নানি : ওহ্ বেরিয়ে যেতে বলছ! তোমার ঘুম নষ্ট হচ্ছে, তাইতো, তা যাই— (দরজা অবধি যেয়ে আবার ফিরে আসে) ওহ্, একটা কথা. এই আকাশ, আকাশ—

আকাশ : আমি ?

নানি : হ্যাঁ, উহ্ আয়। শুতে যাবি না ?

আকাশ : ওহ্ হ্যাঁ! হ্যাঁ!

(উঠে নানির পাশে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়)

নানি : আমার হাত ধর্, শক্ত করে।

আকাশ : ধরেছি।

নানি : পেছনের দিকে আর দেখিস না— একবারও না

আকাশ : না তাকাব না।

নানি : বল্ আনু আপা যা বলেছে সব মিথ্যা।

আকাশ : সব মিথ্যে।

নানি : মিথ্যে।

আকাশ : মিথ্যে।

নানি : পেছনের দিকে তাকাসনে। বল্ কাল তুই কাকে ভোট দিবি ?

আকাশ : আলম ভাইকে।

নানি : বল্— যে লোকটার বিস্কিট রঙের সুটের পাশে আকাশ রঙের সার্টের ওপর—

(বলতে বলতে ওরা দু'জন বেরিয়ে যায়। আনোয়ারা আর গুণ্ডা স্থির চোখে দেখে। তারপর গুণ্ডা মাথা ঘুরিয়ে চোখ টেনে মেলে ধরে, আনোয়ারার মুখের ওপর। আনোয়ারা কঠিনমুখে, ঠাণ্ডা ঠোঁট দুটো দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে চোখে চোখে চায়। সে চোখে আলো নয় আগুন ঠিকরে পড়ছে।)

(গুণ্ডা আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর আরো সোজা হয়ে, ভারী পা ফেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়)

(আনোয়ারা উঠে দরজাটা টেনে দেয়। একবার পালঙ্ক অবধি আসে, আবার দরজা অবধি যায়। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়)

(রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে আর আনোয়ারা খানমের সাজানো দেহ ঘুমে এলিয়ে পড়ে বিছানার ওপর)

[প্রায় এক মিনিট রঙ্গমঞ্চ থাকবে নিস্তব্ধ, নিশ্ছিদ্র, অন্ধকার। এক মিনিট কয়েক ঘণ্টার প্রতীক। আনোয়ারা খানম ঘুমুচ্ছে। ঢনঢন করে রাত্রি দুটোর ঘণ্টা পড়লো। একটু পরেই রঙ্গমঞ্চে একটা শব্দ হলো— খুট্। কে একটা লোক যেন ঘরে ঢুকতেই, সিগ্রেট কেস খোলার শব্দ। তারপরেই ফস্ করে একটা শব্দের সাথে রঙ্গমঞ্চের মধ্যিখানে এক আলো জ্বলে উঠলো। সে আলোতে দেখা গেল আনোয়ারা খানমের পালঙ্কের পাশে একটা লোক। ঠোঁটে সিগ্রেট, মুখের নিচে একটা লাল টাই। বিস্কিট রঙের সুটের নিচে আকাশ রঙের সার্ট। মাথার হ্যাট্ পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া, হাতের লাইটার দিয়ে সিগ্রেট ধরাতে যেয়েই লোকটা থমকে গেল— সিগ্রেট ফেলে দিয়ে নিচু হয়ে দেখতে লাগল আনোয়ারা খানমের ঘুমন্ত মুখ।

সমস্ত রঙ্গমঞ্চের মধ্যিখানে ছোট্ট একটি আলোক শিখার শীর্ষবিন্দু। লোকটার ঝুঁকে পড়া নাক আর আনোয়ারা খানমের ঠোঁটের প্রান্তদেশ মাত্র দু'বর্গ ইঞ্চি পরিধির মধ্যে।

ঘন সন্নিবেশিত, স্থির। হঠাৎ লোকটার ঠোঁট বুদবুদের মতো ফুলে উঠতেই টুপ করে এক ফোঁটা চুমু পড়ল আনোয়ারা খানমের ঘুমন্ত ত্বকে।

সাথে সাথে লোকটাও চোখ বন্ধ করে ফেলল— কিন্তু আশ্চর্য তেমন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। চোখ খুলে লোকটা একটু বোকা হলো—বিরক্ত হলো। ঘুরে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। শেডটা ঘুরিয়ে আলো ফেলল ঠিক আনোয়ারার মুখে।

লাইটার দিয়ে টেবিল ঠুকল কিন্তু আনোয়ারা খানম ঘুমুচ্ছে। বেপরোয়া হয়ে লোকটা তখন টেবিলের ওপর থেকে একটুকরো কাগজ দিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল, প্রথমে আস্তে পরে জোরে।

(একটা জোরে নাকে লাগতেই—)

আনু : কে ? কে ? গুণ্ডা ?

আলম : (অবাক) গুণ্ডা ?!

আনু : ওহ্— না না আপনি আপনি ? (লাফিয়ে ওঠে) আলম সাহেব ? (চোখ কচলে) আপনি এখানে কি চান এতো রাতে ? আপনি—

আলম : থাক্ চিনতে পেরেছেন তবু! কী সব চোর ডাকাত বলছিলেন প্রথম প্রথম— ভয়ই পেয়ে গেছলাম।

আনু : আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা ?

আলম : বেরিয়ে— কোথা দিয়ে ?

আনু : যেখান দিয়ে আপনার মতো অসভ্য বর্বর অসচ্চরিত্র লোকরা—

আলম : ঐ তো ঐ তো আপনি আবার আরম্ভ করলেন।

আনু : এ ঘর থেকে আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা ? নিজের চেহারা আর সামান্য একটু গুণের দৌলতে কতদূর দুঃসাহসিক হওয়া যায়, তা বোধহয় আন্দাজ করে উঠতে পারেননি— না ?

আলম : Thank you! বরাবরই জানতাম যে আপনি আমার গুণ আর রূপ উভয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। লুকিয়ে আর লাভ কী আপনার সম্বন্ধে আমার মনের অবস্থাও—

আনু : আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন কিনা বলেন ?

আলম : বারবার ঐ এক কথা। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান— আমি— আপনাকে খেয়ে ফেলছি নাকি ? বেরিয়ে যান বললেই হবে না, বেরিয়ে যাবো কোথা দিয়ে ?

আনু : বেশ লোক তো আপনি, এ ঘর যেন আপনার। ফক্কড়ি ছেড়ে, সোজা যে পথে এসেছিলেন সে পথে বেরিয়ে যান—ঐ জানালা দিয়ে পাইপ বেয়ে।

আলম : জানালা দিয়ে ? (উঠে এসে জানালা দিয়ে নিচের দিকে দেখে) ওউহ্— এত উঁচু থেকে— বাবা! ও আমার দ্বারা হবে না। নামবার আগেই নার্ভাস হয়ে মারা যাব।

আনু : আসবার সময় মারা যাননি ? তখন এলেন কী করে ?

আলম : তখন কাজের কথা মনে করে এসেছি। কাজটাই ছিল মনের সামনে বড় হয়ে— পথ লক্ষ করার অবসরই ছিল না।

আনু : কী এমন কাজ ছিল আপনার সেটা যেটা আপনাকে বাঁদরের মতো রাত দুপুরে এতটা পথ শূন্যে লাফিয়ে নিয়ে এল। কী কাজ ?

আলম : বলছি— তবে আপনি ও সব অল্প-চল তুলনা ভবিষ্যতে আর ব্যবহার করবেন না। মেয়েদের মুখে ওটা ভাল শোনায় না।

আনু : আপনি আপনার কাজের কথা বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান।

আলম : আচ্ছা তাই যাব। যাওয়ার সময় কিছু তুলো আর আইডিন দিয়ে দেবেন সঙ্গে।

আনু : কেন পড়ে গেলে হাত পা ব্যান্ডেজ করবেন ?

আলম : না নিজের জন্য চাইনি। গেটের দারওয়ানটার জন্য চাইছি।

আনু : অর্থ ? (ভয়)

আলম : ঢুকবার সময় সাইকেলের বেলটা খুলে পেছন থেকে ব্যাটার খুলিতে মেরেছিলাম। এতক্ষণে মরে গেছে কিনা কে জানে ?

আনু : মরে গেছে ?

আলম : কে জানে ? হয়তো।

আনু : অত জোরে মারতে গেলেন কেন ? (সহানুভূতি)

আলম : ঐতো আবার বোকার মতো প্রশ্ন করছেন— তখন কি আর পরিণতির কথা খেয়াল ছিল ? (পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা এক সিট ছাপান কাগজ বার করে) ধরুন, কাগজটা ধরুন, আমি চটপট আমার কাজের কথা সেরে খসে পড়ি।

আনু : (দরদ) কিন্তু যাবেন কোথা দিয়ে— ঐ গেটের মরা লোকটার লাশ দেখে ভয় করবে না ?

আলম : আমার যাবার পথের কথা আপনার না ভাবলেও চলবে। কাজের কথা শুনুন। ঐ হলো আমাদের পার্টির ম্যানিফেস্টো—ওতে আমাদের নাম গুণ— সব লেখা আছে। দয়া করে ভোট দেবেন। ব্যাস আর কিছু বলবার নেই। আমার ব্যান্ডেজগুলো দিয়ে দিন চলে যাই।

আনু : ক্যানভাস করার কি উপযুক্ত সময়-আপনার রুচি আছে বলতে হয়!

আলম : সত্যি বলছি কাজের ভিড়েই এ কয়দিন তোমাকে একবারও বলতে সময় পাইনি। ভাবলাম কাল ভোরেই তো ভোট আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি নিজে একবারও তোমায়—

আনু : আর আমিনা, জুলেখা, রাশেদা, ওদের নিজে বাসায় যেয়ে খবর দেবার সময়ের অভাব হয়নি না ?

আলম : ওহ সেই কথা!

আনু : হ্যাঁ! সেই কথা ! কতক্ষণ ছিলেন আমেনাদের বাসায় ?

আলম : তা ওদের বাসায় একটু দেরি হয়ে গেল— প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম হয়তো।

আনু : অতক্ষণ ধরে শুধু ক্যানভাস করছিলেন ?

আলম : ছিঃ ছিঃ কী আশ্চর্য ওর বাবার সঙ্গে কথায় কথায় আটকে পড়লাম যে!

আনু : জুলেখাদের বাড়িতে ক্যানভাস করতে যেয়ে চা খেলেন কেন ?

আলম : মহাবিপদ, ছোটবোনের বন্ধু, চা খেতে দেয়— আমি তো আর সেটা দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসতে পারি না!

আনু : আর কাল বিকেলে লাইব্রেরির বারান্দা দিয়ে আসবার সময় আমার সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে কী বলছিলেন ?

আলম : ওহ তুমি তখনও ভেতরে বসে পড়ছিলে ?— সত্যি আমার মনেও হয়নি যে—

আনু : সে কথা থাক্। আমার সম্বন্ধে কী বলছিলেন সেটা মনে করতে চেষ্টা করুন।

আলম : পাগল নাকি সে-সব কথা এখনও মনে করে বসে আছি নাকি ?

আনু : বলছিলেন আমার মুখ শালগমের মতো— ঠোঁট কাতলা মাছের মতো— মন গোখরা সাপের—

আলম : (দু'ধমক হেসে) আরে ওসব কথা এখনো মনে করে বসে আছ নাকি ?

আনু : স্মরণশক্তি আমার যখন তখন দুর্বল হয় না বলে মনে থেকে যায় ওসব কথা।

আলম : (কোনো রকমে হাসি গিলে) আর ওসব কথা তুমি বিশ্বেস করলে ?

আনু : তোমার কথা অবিশ্বাস করার অভ্যেস আমার নেই।

আলম : ছিঃ ছিঃ! ওসব কি আর তোমাকে বলেছিলাম নাকি ? ওসব বলেছিলাম কতগুলো অন্য ছাত্রকে, যারা তোমাকে হয়তো কোনো কারণে সহ্য করতে পারে না, যারা তোমার নিন্দা শুনলে খুশি, যারা তোমার নিন্দা আমার মুখে শুনলে আরো খুশি হয়, যারা খুশি হলে আমি ভোট আরো বেশি পাই।

(বলতে বলতে লোকটা হাসির আবেগে ঝুঁকে পড়ল)

আনু : সত্যি। সত্যি তাহলে তুমি তাহলে ওসব কথার একটুও মন থেকে বলনি! সত্যি ?

আলম : সত্যি নয়তো মিথ্যে নাকি ?

(বলতে বলতে আমোদে আলম দুলে উঠল হাসির বিক্ষুব্ধ আলোড়নে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে আর হতভম্ব আনোয়ারা খানমের হাঁটুতে এক কামড়। আনোয়ারার চিৎকার তখন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো যখন দেখলো আলম সাহেবের মাথার হ্যাট খুলে পড়ে গেছে আর যেখান থেকে একরাশ ঘন কালো চুল সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো তাদের গুণ্ডার পিঠে লুটোপুটি খাচ্ছে। দলির পালঙ্কের নিচ থেকে হাসির আর এক তাল পিণ্ডি গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এলো আকাশ আর নানি হয়ে। নানি কোনো রকমে মুখে শাড়ি গুঁজে দিয়ে টলে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে একটা চিঠি দিলো আনোয়ারা খানমের হাতে আর—)

নানি : সুটটা অবশ্য গুণ্ডার গুণ্ডামি। বাকিটুকু বিশ্বেস না হয় পড়ে দেখ। আলম সাহেবের চিঠি। বিকেলে এসেছিল। আমরা পড়ে দেখেছি। অত্যন্ত শর্মিন্দা সেজন্যে।

[আনোয়ারা খানম আচমকা চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, বালিশে মুখ গুঁজে]

[যবনিকা]

বেশরিয়তি

চরিত্র

জাফর

লায়লা

আব্বা

চাকর

নয় ও এগার বছরের দুই ছেলে

[দৃশ্য : রঙ্গ-মঞ্চের একেবারে সম্মুখ ভাগে একটা বড় টেবিল। টেবিলের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা কালো পর্দা অত্যন্ত হেকমতের সঙ্গে ঝোলান, যাতে টেবিলের দু'পাশ দিয়ে দুটো লোক যথেষ্ট বদমতলব নিয়ে ঘোরা-ফেরা করলেও পরস্পরকে দেখতে পাবে না অথচ দর্শকরা সব সময়েই দুজনকে দেখতে পাবে।

পর্দার দু'পাশে বসে দু'টি মানুষ; একজন পুরুষ অন্যজন মেয়ে। মেয়েটির বয়স আঠারো। স্বচ্ছ সবুজ ওড়না পিঠের পুরু বেণিকে ঘিরে বুকের উপর আলগোছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ফিকে সবুজ সাটিনের সেলওয়ার থেকে আরম্ভ করে গায়ের বুটিদার সাদা মুগা পাঞ্জাবিটার ভাঁজে ভাঁজে একটা জোর করে আয়ত্ত করা পরিপাট্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এ মেয়ে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সাজানো-গুছানো ঐ শান্তিময় আবহাওয়াটাকে যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে পারে। চোখ জোর করে পর্দার ওপর মেলে রাখা, হাত দুটো জোর করে টেবিলের ওপর শান্ত করা। যে-কোনো মুহূর্তে সবকিছু আলুথালু, বিস্রস্ত ও বিবসনা হয়ে যেতে পারে।

পর্দার এ পাশের তরুণ মেয়েটির শিক্ষক, তরুণোত্তোর যুগের স্পন্দনহীন গাম্ভীর্য দিয়ে নিবিষ্ট মনে পেন্সিল দিয়ে একটা খাতা দেখছেন। ফর্সা লম্বা মুখে কালো এক পলতা চাপ দাড়ি, মাথায় কোঁকড়ানো সাদা পশমের টুপি। গায়ে কালো আচকান। সুগঠিত শরীর। মুখে পুরুষজনোচিত সৌন্দর্য। তবে এখন মুখে চোখে এমন এক ধরনের সংযত স্থৈর্য ফুটে আছে যা দেখলে পরমুহূর্তে এ লোকটা কী করবে না করবে তা আগে থেকে আঁচ করা অসম্ভব। প্রথম শব্দ করলো মেয়েটি—]

মেয়েটি : আচ্ছা মাস্টার সাহেব একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?

মাস্টার : কী ?

মেয়েটি : আপনি টুপি পরেন কেন ?

মাস্টার : তুমি দেখলে কী করে ?

মেয়েটি : বা! ও মেয়েরা আড়াল থেকে সব দেখতে পায়!

মাস্টার : তাহলেও তোমার দেখা উচিত হয়নি।

মেয়েটি : আপনি বড় আজগুবি কথা বল্লেন মাস্টার সাহেব, আমি কি ইচ্ছে করে দেখেছিলাম নাকি ?

মাস্টার : দেখ লায়লা, তোমার কথাবার্তার ঢংটা, তোমার আমার সম্মানজনক ব্যবধানকে সব সময় স্বীকার করতে চায় না।

লায়লা : কী করব তাহলে ?

মাস্টার : ভঙ্গিটা বদলাতে চেষ্টা কর।

লায়লা : পারব না।

মাস্টার : (চটে গিয়ে) না পারলে ও-রকম যখন তখন কানের কাছে 'মাস্টার সাহেব' চিৎকার করো না, 'জাফর ভাই' বলে ডেকো আমাকে।

লায়লা : এখন থেকে তাই ডাকব যতক্ষণ অবধি আব্বা না শুনছেন।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। জাফর খাতা দেখে। লায়লা ওড়না মুখে দিয়ে একটা হাসির শব্দকে চেপে ধরতে চায়।)

জাফর : হাসলে কেন ?

লায়লা : দেখলেন কী করে ?

জাফর : দেখিনি, শুনেছি। হাসলে কেন ?

লায়লা : আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন সেদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ছিল, তাই।

জাফর : সেদিন কী হয়েছিল ?

লায়লা : হবে আবার কী ? পাকের ঘরে বসে শুনলাম আমার নতুন মাস্টার আব্বার সঙ্গে গল্প করছে। সে নাকি অদ্ভুত সুন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে এবার নাকি ইকনমিক্সে এম.এ পাশ করেছে।

জাফর : বিশ্বেস না হলে গেজেট খুলে সেটা পরখ করে নিতে পারবে, কিন্তু এতে হাসবার কী আছে ?

(জাফর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে)

লায়লা : দৌড়ে ছুটে এলাম বাইরের ঘরের দরজায় পর্দার ফাঁক দিয়ে আপনাকে দেখব বলে—।

জাফর : গরাদের ফাঁক দিয়ে যেমন করে চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দি বাঘ দেখ, তেমনি করে, না ? কিন্তু হাসলে কেন ?

লায়লা : আপনি চটে গেছেন জাফর ভাই ?

জাফর : (চিৎকার করে) না!

লায়লা : তবে অমন করে পর্দা ধরে ঝাঁকানি দিলেন কেন, যদি ছিঁড়ে যেত ?

জাফর : ও তোমার মনের ভুল, পর্দায় আমি হাত দেইনি।

লায়লা : হবে হয়তো। আমি কিন্তু প্রথম দিনই আপনাকে দেখে ঘাবড়ে গেছলাম, সত্যি আপনি টুপি পরেন কেন ?

জাফর : পরি মুসলমান বলে। আর তুমি ঘাবড়ে গেছলে কারণ এর আগে কোনো বলিষ্ঠ তরুণ মুসলমান জ্ঞানী ছেলে তোমার সামনে টুপি মাথায় দিয়ে চলেনি বলে! বিকৃত সমাজের আওতায় গড়া তোমার মন মিথ্যেকে ভালবেসে এত অভ্যস্ত যে সবসময় সত্যকে সইতে পারবে না— তাই।

লায়লা : আমার কিন্তু অন্য রকম বলে মনে হচ্ছিল! আপনি টুপি পরেছিলেন আব্বাকে কাবু করবার জন্যে!

(উঠে ওড়না ওড়াতে থাকে)

জাফর : লায়লা!

লায়লা : আমাকে ডাকছেন ?

জাফর : তবে কি ঐ ঝুলন্ত পর্দাটাকে ডাকছিলাম নাকি ? তুমি কী বলতে চাও লায়লা ?

লায়লা : বাঃ সে তো একটু আগে বললাম-ই।

জাফর : নিজকে খুব সুন্দরী লোভনীয় স্ত্রী বলে ভাব, না ?

লায়লা : আমি ভাবতে যাব কেন, লোকে বলে! আগে যিনি পড়াতেন, তিনিও বলেছেন।

জাফর : কী বলেছেন ?

লায়লা : আমি সুন্দরী।

জাফর : কার কাছে বলেছিলেন ?

লায়লা : বেচারা ভদ্রলোক এমনি বোকা ছিলেন যে আমাকে না বলে একদিন গল্পে গল্পে বেফাঁস হয়ে আব্বার কাছেই বলে ফেলেছিলেন।

জাফর : আমি অতটা বোকা নই লায়লা।

লায়লা : তা হলে আমাকে দেখতে হয় এক ফাঁকে লুকিয়ে দেখে নেবেন। আব্বার কাছে না বললেই আর ভয় নেই— চাকরি যাবে না।

জাফর : তোমাকে দেখতে হলে ফাঁকি দিয়ে চুপ করে এক নজর দেখে লুকিয়ে পড়ার মতো ভীতু তোমার জাফর ভাই নয়। দু'হাত দিয়ে তোমার মুখ উঁচু করে দু'চোখ মেলে দেখবার সাহস তার আছে লায়লা—!

লায়লা : তাহলে দেখে নিলেও তো হয়। খাম্‌কা পর্দাটাকে ও-রকম অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কেন ? (হঠাৎ গলার সুর বদলে) মাস্টার সাহেব—

জাফর : কী বললে ?

লায়লা : বাকি অংকগুলো করে রাখব। আপনার চা এসে গেছে।

জাফর : ওহ্—!

(পর্দার যে অংশে লায়লা সেদিককার অন্দর-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল চাকর। হাতে ট্রেতে পরোটা-কাবাব ও চা। চাকর পর্দার যে প্রান্ত রঙ্গমঞ্চের একেবারে পেছন অবধি গেছে সেখানে গুঁজো হয়ে টুপ করে অত্যন্ত সুকৌশলে পর্দা উল্টে ওপাশে গিয়ে ভুস করে উঠল। জাফর সপ্রশংস দৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করল।

জাফর : (চায়ে মুখ দিয়ে) সাহেব কোথায় রে তোদের ?

চাকর : ফজরের নামাজ পড়ে ভোর রাতে শুয়োর শিকারে বেরিয়ে গেছেন, এই এখুনি ফিরবেন হয়তো!

জাফর : ওহ্! তোমার আব্বা বুঝি খুব ভালো বন্দুক ছুড়তে পারেন লায়লা ?

লায়লা : হ্যাঁ বন্দুক আর পর্দাতে তার একমাত্র নেশা।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা পান খতম হলে পর চাকর পূর্বোক্ত পন্থায় এদিকে অপসৃয়মান হয়ে ওদিকে উদীয়মান, তারপর দরজা পথে অদৃশ্য)

জাফর : তোমার আব্বাকে আমার কোনোদিনই অত ভয়ঙ্কর মনে হয়নি।

লায়লা : আব্বা এখনো আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হননি, আপনার লেখা পড়েননি, তাই আপনার সঙ্গে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠাও প্রয়োজন মনে করেননি।

জাফর : যখন জানবেন তখন কী হবে ? আগের মাস্টারের মতো আমাকেও তাড়িয়ে দেবেন ?

লায়লা : আপনার বেলায় তার চেয়েও বেশি হতে পারে। ধোকা যে দেয় আব্বা তাকে কক্ষণো এমনিতেই ছেড়ে দেন না। হয়তো টোটা ভরা বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে আসবেন!

(জাফর আস্তে আস্তে কেমন যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে)

জাফর : তোমার আব্বাকে তুমি অমন সাংঘাতিক চোখে দেখো কেন ? সত্যি সত্যি তোমার আব্বা কিন্তু অত্যন্ত নরম মনের লোক।

লায়লা : নরম না, তুলতুলে না ? চোখে তো কেবল ঐ একটি মাত্র পুরুষকেই সামনা-সামনি দেখেছি, জেনেছি— এই যদি তাঁর কোমলতার নিদর্শন হয় তবে আর পুরুষ দেখে আমার কাজ নেই !

(যেন এর পর পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর কোনো নারীর আর কিছু বলবার নেই এমনি একটা ভাব করে লায়লা সরাসরি সহজ ভঙ্গিতে টেবিলের ওপরেই চড়ে বসে। এবং নেহায়ৎই দৈবক্রমে জাফর ঠিক ঐ মুহূর্তে পর্দার ও-পাশের কথা নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুনতে টেবিলের ওপর চড়ে বসেছে।

জাফর : তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন পড়ো লায়লা তখন ছেলেরা কিন্তু তোমার সম্পর্কে—

লায়লা : বিশ্ববিদ্যালয়। যাক অত স্বপ্ন দেখে আমার কাজ নেই। আব্বাকে বন্দুক হাতে দেখেছেন কখনো ?

জাফর : কেন ?

লায়লা : দেখলে আমার স্বপ্ন নিয়ে অমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা আপনি কক্ষণো করতেন না।

(গলার স্বর ভারি)

জাফর : আরে একী, আমি কী বললাম আবার!

লায়লা : একদিন শুধু আব্বাকে বলেছিলাম, আব্বাজান, বাড়িতে এত কলকব্জা বসিয়ে টাকা খরচ করে মাস্টার না রেখে আমাকে কোনো মেয়ে কলেজে ভর্তি করে দিলে এমন কী দোষ হয় ?

জাফর : কী বললেন তোমার আব্বা ?

লায়লা : বললেন, পড়ালেখা শিখলে বেহায়া, বেআব্রু, বেশরম হবার প্রবল ইচ্ছা তার মেয়েরও যে জাগতে পারে একথা নাকি তাঁর আগেই ভাবা উচিত ছিল।

জাফর : তারপর ?

লায়লা : শেষে বললেন, এখন যখন মেয়ে তাঁর বিদুষী হয়ে উঠেছে তখন মেয়ের যা ইচ্ছে করতে হবে বৈকি!

জাফর : তুমি কী বললে তখন ?

লায়লা : কী বলব আবার— কেঁদে ফেললাম আর কী!

জাফর : ছিঃ কাঁ-দ্-লে! ভিজে সলতের মতো লতিয়ে না পড়ে দপ করে একবার জ্বলে উঠতে পারলে না লায়লা ?

লায়লা : কেবল কথা, কথা আর কথা! আপনার ঐ সব সাজানো-গুছানো আগুন জ্বালানো কথা আপনার লেখা থেকে আমারও ঢের ঢের মুখস্ত আছে।

জাফর : আমার সাহিত্যের কথা হচ্ছে না লায়লা, আমি তোমার জীবনের কথা ভাবছি—

(দু'হাত দিয়ে জাফর পর্দাটা মুঠ করে ধরে— একটু হলেই লায়লার নধর বেণিতে হাত পড়েছিল বলে।)

লায়লা : থাক এক কণা যার কথা ছাড়া কিছু করবার মুরোদ নেই তার আমার সম্বন্ধে কিছু না ভাবলেও চলবে। তার চেয়ে ঘরে বসে বিদ্রোহমূলক সাহিত্য রচনা করুন—খুব শান্তি পাবেন।

জাফর : তুমি ভুল জায়গায় আঘাত দিচ্ছ লায়লা! আমি যা বিশ্বেস করি তা কাজে প্রকাশ করার জন্য তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা না করলেও পার।

লায়লা : সত্যি ?

(টেবিল থেকে ধীরে নেমে লায়লা জ্বলন্ত চোখে পর্দার বিশেষ দুই বিন্দুতে চেয়ে থাকে। যেখানে জাফরের মুঠ করা হাতের চাপে এত হেকমতে দাঁড় করানো সমস্ত কাপড়ের দেয়ালটা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে।)

জাফর : জানো লায়লা, শক্তি আমার লেখায় নয়, শক্তি আমার এই দুই বাহুতে। যে মুহূর্তে যখন যা ইচ্ছে করেছি তখনই তা অর্জন করেছি।

লায়লা : এত শক্তি! আর কেবল যে দুর্বল বিদ্রোহ করতে চায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটুকুই নেই ?

জাফর : কী বলতে চাও তুমি পরিষ্কার করে বল লায়লা।

লায়লা : পারেন এই মুহূর্তে দু'হাত দিয়ে এ পর্দাটাকে ছিঁড়ে কেড়ে কুটি কুটি করে আমার পাশে এসে—

(কিন্তু বাক্য শেষ করবার আগেই চিৎকার করতে করতে ন'বছরের একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে পেছনে ধাবমান এগারো বছরের একটি ছেলের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে হুড়মুড় করে হোঁচট খেল একেবারে পর্দাটার শেষ প্রান্তে এবং অত্যন্ত বিপদজ্জনকভাবে আন্দোলিত পর্দার প্রতি চোখ পড়তেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল লায়লা—)

জাফর : কী, কী হলো, কথা বলছ না কেন ?

লায়লা : (সামলে) কিছু না, ছোট ভাই দু'টো মারামারি করছিল মাত্র।

জাফর : কিন্তু তুমি চিৎকার করে উঠলে কেন ?

লায়লা : আপনার কি চোখ নেই নাকি ? যে-ভাবে ওরা পর্দার ওপর হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ছিল তাতে পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারতো যে!

(ছেলে দুটো এ সংলগ্ন অসম্মানজনক সংলাপে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে— কোনো রকমে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।)

জাফর : (হাসির শব্দ)

লায়লা : হাসলেন যে ?

জাফর : বিদ্রোহীর সাহস দেখে।

লায়লা : বিদ্রোহী খুব সাহসী বলে বড়াই করেছিল ?

জাফর : মনে না থাকলেও সাহস ভিক্ষে করার কণ্ঠস্বরে তার জোর যে যথেষ্ট মজুদ ছিল।

লায়লা : আমার অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করলে কেঁদে ফেলব জাফর ভাই।

জাফর : তার আগেই আকাশচুম্বী লোহার কাপড়টাকে ডিঙ্গিয়ে কেউ যদি বিদ্রোহীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বিদ্রোহী তখনও কাঁদবে ?

(পকেট থেকে দেশলাই বার করে)

ধর এখন যদি আমি—

লায়লা : জাফর ভাই সাবধানে কথা বলো, বাইরের ঘরে আব্বার গলা শুনা যাচ্ছে, এখুনি এসে পড়তে পারেন।

জাফর : এখনও অনেক দূরে আছেন তোমার আব্বা, ধর এই মুহূর্তে আমি যদি এখনই সমস্ত পর্দাটায় আগুন লাগিয়ে দিই ?

(কাঠি ধরাবার প্রচেষ্টায় দেশলাইর বারুদে কাঠি ঘষার শব্দ)

জ্বলন্ত কাপড়ে লেলিহান শিখা—

লায়লা : (ভয়ার্ত) জাফর ভাই— জাফর ভাই!

জাফর : চিৎকার করছ কেন, ভয় পেলে ? আমি পাশে থাকতেও ?

লায়লা : (হঠাৎ) দাও, জ্বালিয়ে দাও জাফর ভাই। দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। আমাদের মাঝখানের কালো কুৎসিত দেয়ালটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক— চমৎকার হবে দেখতে! দেরি করছ কেন ?

জাফর : (কাঠি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরায়) নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এতক্ষণে! নাঃ এখন খামকা আর অগ্নিকাণ্ড করে লাভ কী ? (পর্দার সম্মুখ প্রান্ত ধরে)

লায়লা : আমার কিন্তু ভয় করছে জাফর ভাই, যদি আব্বা এসে পড়েন ?

জাফর : একলা আছ বলেই ভয় করছে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে ঐ কালো পর্দাটাই তখন হয়ে উঠবে বাইরের ঘন দুর্যোগের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিন দুর্গ।

(লায়লা ভয়ে চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ রেখেই অনুভব করলো জাফরের দীর্ঘ দেহ পর্দা ঠেলে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রচালিতের মতো দু'হাতে ওড়ানাটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আরও কয়েক মুহূর্ত। চোখ মেলে—)

লায়লা : আপনি—

জাফর : তুমি, তুমি এত সুন্দর লায়লা!

(এমনি সময়ে পর্দার ও-পাশে ঘরে প্রবেশ করলেন গম্ভীর আব্বাজান। হাতে বন্দুক)

আব্বা : লায়লা!

লায়লা : জি।

আব্বা : তোর মাস্টার কখন গেল ?

লায়লা : একটু আগে।

আব্বা : ওর ভাগ্য ভালো যে আজ ও আমার চোখের সামনে পড়েনি। বেঁচে গেল।

লায়লা : কী বললেন আব্বাজান ?

আব্বা : (একটু অস্থির পায়চারি করে) বড্ড মুশকিলে পড়লাম, লোকটা খারাপ অথচ পণ্ডিত যে, বিদ্বান যে। লোকটা নাকি প্রবন্ধ লেখে বড় বেহুদা, বেফয়দা, বেশরিয়তি কথা নিয়ে—

[বলতে বলতে যে দরজা দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়েই বেরিয়ে যান]

[যবনিকা]

একাংকিকা

চরিত্র

আব্বাজান

খোকা

জ্যেষ্ঠপুত্র

আম্মাজান

কন্যা

[পর্দা উঠিলে— দেখা যাইতেছে আব্বাজান বারান্দায় একটি পাটিতে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত এক সুবৃহৎ কিতাব পড়িতেছেন। তন্ময় চিত্তে মাঝে মাঝে আইন-গাইনে সমাকীর্ণ এক-আধ লাইন আবৃত্তিও করিতেছেন।

আব্বাজানের বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি হেলিয়া পড়িয়াছে। দাড়ি, চুল সাদা। মাথার কিস্তি টুপি সাদা। পোশাক সাদা পাঞ্জাবি এবং সাদা লুঙ্গি।

এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল পেটুক খোকা— বয়স বার। পরিধানে হাফ্‌প্যান্ট, হাতে গুল্‌তি। তারপর সমস্ত পবিত্র গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া—]

খোকা : হলো এখন ! হুম্— আমরা কেউ ও-রকম কাণ্ড করলে এতক্ষণে রক্ষা ছিল না। জবাই-ই করে ফেলতেন হয়তো। অথচ—

আব্বা : (কিতাব বন্ধ করিয়া) কী, কীসের কথা বলছিস ? কে কী করল আবার ?

খোকা : কে আবার। বড় আপার আদুরে বকরি আপনার নামাজের—

আব্বা : এ্যাঁ! (দাঁড়াইয়া) আবার নামাজের ঘরে ঢুকেছে ?

খোকা : ঢুকেছে নয়, ঢুকে বেবাক কিছু বরবাদ করে দিয়েছে, নাপাক করে দিয়েছে।

আব্বা : উহু! হারামজাদা আর জায়গা পেল না, না ?

খোকা : তবু তো আপনি ওটাকে কিছু করবেন না।

আব্বা : করব না মানে ? শুয়োরটা গেল কোথায় এখন, একবার ওটাকে ধরে নিয়ে আয় তো এখানে।

খোকা : ভাইজান নিয়ে আসছেন। আপার কান্নাকাটির জন্যেই দেরি হচ্ছে হয়তো।

আব্বা : কান্নাকাটি, ওই কুকুরটার জন্যে আবার দরদ দেখানো হচ্ছে! (জোরে হাঁকিয়া) কৈ, বকরিটা আনলি না এখনো ?

(নেপথ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের কণ্ঠস্বর) —এই যে আনছি, আব্বাজান।

(এবং একটু পরেই একটি নাদুস-নুদুস চক্‌চকে বকরির গলার দড়ি ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে প্রবেশ করিল স্বাস্থ্যহীন জ্যেষ্ঠপুত্র। পিছনে অশ্রুসজল কাতর চোখে মেদবহুলা কন্যা)

আব্বা : আজকে চাব্‌কে ওর খাল তুলে ফেলব।

জ্যেষ্ঠপুত্র : চাবকালে ওটার কিছু হবে না আব্বাজান, দেখছেন না খেয়ে খেয়ে কী রকম ফুলেছে; কী রকম জোয়ান আর ধুমসি হয়েছে ?

কন্যা : (বকরির গলা জড়াইয়া, ভাইকে) হিংসুক কোথাকার!

খোকা : অত হাঙ্গামা করে লাভ কী! তার চেয়ে আমি বলি কী ওটাকে সোজাসুজি জবাই করে ফেলা যাক্!

কন্যা : পেটুক, রাক্ষস!

পুত্র : আহা-হা দরদ দেখো, একই রকম দেখতে কিনা!

কন্যা : আব্বাজা-ন!

আব্বা : (গম্ভীর) দেখি, আরেকটু কাছে আন তো বকরিটা।

(কন্যা বকরির কণ্ঠ জড়াইয়া একটু নিকটে সরিয়া আসিল। আব্বাজান অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন।)

কন্যা : (অনুনয়) কী মোলায়েম না, আব্বাজান ? কী অসহায় ছলছলে ওর চোখগুলো, দেখলেই মায়া হয় আব্বাজান, না ? ভয়ে বেচারির বুক দূর্ দূর্ করে কাঁপছে। এরপরও আব্বাজান—

আব্বা : না, ওকে আর চাব্‌কাব না।

কন্যা : বলিনি আমি ?

আব্বা : খোকা, তুই-ই ঠিক বলছিস। এরচেয়ে বেশি গোস্ত হলে চর্বি আরো বেড়ে যাবে, স্বাদ কমে যাবে। আজই জবাই করে ফেলব।

(কন্যা ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। খোকা লাফাইয়া গুল্‌তির ফাঁসে বক্‌রির গর্দান আটকাইল। বড় ভাই খাম্‌চা দিয়া ধরিল দুই ঠ্যাং।)

বকরি : ম্যাহ্ ম্যাহ্ ম্যাহ্ হ্ হ্ হ্ হ্—

আব্বা : তোরা কাঁচাই খেয়ে ফেলবি নাকি ?

খোকা : ভাইজান তোমার হলো পেছনের দিকটা, আমি কিন্তু মাথার দিকটা ছাড়ছি না। আব্বাজান পাবেন মধ্যেরটুকু। আপা তো নিশ্চয়ই খাচ্ছে না।

কন্যা : (ফোঁপাইয়া) গেদ্দার, ভল্লুক-নেকড়ে!

খোকা : ঘাড়ের চামড়াটা দেখেছ ভাইজান, কী নরম! আপার চেয়ে বেশি তুলতুলে। আজিজ দরওয়ানের (একটু ভেবে) না না আজিজ নয়, ও তো কেমন ঘসে ঘসে কাটে। সেলিম বাবুর্চি ঝকঝকে মুরাদাবাদী ছুরিটা যখন—

পুত্র : (শিউরে) আহা-হা অমন করে তুই বলিস না।

খোকা : আমার জবাইর কথা শুনতে ভয়ঙ্কর খারাপ লাগে।

আব্বা : তোরা যে দেখছি মুখেমুখেই ওটাকে জবাই করে রেঁধে ফেলবি!

খোকা : ভাইজান যেন কী! জবাইর সে সুরখ রক্ত জমে ক্ষুদে মতন এক হ্রদ হবে, জেলির মতো থক্‌থকে লাল পানি— সে সব কথা ভাবতেই তো সব মজা!

কন্যা : জল্লাদ, ভ্যাম্‌পায়ার!

খোকা : চামড়াটা কিন্তু এবার বিক্রি করা হবে না।

আব্বা : ওটা কোনো সাহায্য ভাণ্ডারে দান করতেই হবে।

পুত্র : তোর ওসব জল্লাদের কথা একটু থামাবি খোকা ? উহ্ কী নৃশংস কল্পনা।

আব্বা : তোদের দেখছি আর তর সয় না। এখনই তো আর জবাই হচ্ছে না, ও-সব কথা থাক না এখন। গোস্ত নাম শুনলেই হলো, অমনি সে-গল্পে মশ্‌গুল! মাথায় বুঝি অন্য কিছু খেলতেই চায় না ?

খোকা : ভালো কথা মনে করিয়েছেন, আব্বাজান। মৌলভি সাহেবও সেদিন বলছিলেন বক্‌রির জিব্ খেলে নাকি জেহেন্ বাড়ে।

কন্যা : যেমন ওস্তাদ তেমনি শাকরেদ।

খোকা : ও, বুঝেছি ওটা বুঝি আমার চেয়ে তোমারই বেশি দরকার। তবু জিব্ আমি ছাড়ছি না, মাথার দিকটা আমার ভাগে পড়েছে।

কন্যা : তোমার ঐ মুরগিখোর মৌলভি সাহেব বলে দিয়েছেন না ?

খোকা : হুজুরকে নিয়ে যা-তা ঠাট্টা করো না, ভালো হবে না বলছি। পড়ে তো নিরামিষখাগী মাস্টারনীদের কাছে। তিনি আবার এখানে এসেছেন খানদানি খানা নিয়ে তক্ক করতে!

কন্যা : আব্বাজা-ন!

আব্বা : আহা, চুপ কর না। ঝগড়া না করতে পারলে বুঝি জিব সুড়সুড় করে ?

পুত্র : তাও অতটুকু একটা জিব্ নিয়ে!

খোকা : তোমার কাছে অতটুকুন লাগল, না ? মসলা দিয়ে কেঁচে-নেয়া জিব্ পনির আর সালাদের টুকরো মিশিয়ে চিবুতে— আহা।— বড় বড় দুটো ঠ্যাং সাবড়াতে পারলেই বুঝি খুব খানা হলো!

পুত্র : (বিজ্ঞ হাসি) হুঁ হুঁ, নেহায়েত ছেলে-মানুষ তুই, ক'দিন ধরেই আর খাচ্ছিস ? আরে বোকা, ঠ্যাং কি আর এমনিই পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব নাকি ? এই গোস্তাল রান দুটো দেখেছিস তো, এই উঁচু জায়গাটা ? এটা দিয়ে হবে শাহী তেক্‌কা। ভাঝা ঘিয়ে পুড়ে ওপরটায় যখন আধপোড়া একটা পল্লা পড়ে উঠবে (চুকচুক) তখনই মেলা খুলবে বাহার।

কন্যা : (তন্ময় চিত্তে) তাহলে একটা আলাদা কয়লার উনুন তুলতে হবে ভাইজান, আমাদের এ চুলোয় করলে কাঠপোড়া ঝাঁঝ আর ধুঁয়োর গন্ধ থেকে যাবে। খেয়ে-খেয়েই তো শরীরটা অমন খারাপ করলে। সত্যি এত খানা চেন তুমি !

আব্বা : (বিজ্ঞতরো হাসি) ধ্যেৎ-তোরা, আর কীই-বা খেয়েছিস ? তেক্‌কা হয় দুম্বার পাছার বাড়তি গোস্ত দিয়ে, আর নইলে উঁটের কুঁজের গোস্ত দিয়ে, হজ্জ করবার বছর খেয়েছিলাম ওদের দেশে। সে গোস্তের চাকে যেমন নেই আঁশ, তেমনি আবার রাঁধলে পর ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠত ঘন লোয়াবের তার। রাঁধেও বটে ওরা।

কন্যা : ইস্ ও-রকম আমরাও পারি। তুমি কিছু আফসোস করো না ভাইজান,

আমি নিজ হাতে তোমায় তেক্‌কা রেঁধে খাওয়াব। হুঁ! শুধু আরবের মেয়েরাই বুঝি সব জানে।

খোকা : তেক্‌কা আমার চাই না, নাইবা খেলাম। সিনার গোস্তটাই বা এমন কী ফালতু হলো। হবে না আব্বাজান, এটা দিয়ে পরছন্দা কাবাব, হবে না ?

আব্বা : পরছন্দা ? (ভ্রূ কুঁচকাইয়া) আ-আ-হ্যাঁ হ্যাঁ তা হবে, বোধহয়।

কন্যা : (বক্‌রিটাকে ভালো করিয়া দেখে) তা হবে না কেন ? দেখি ? হবে, হবে। তবে সেলিম বাবুর্চি রাঁধলে হয়েছে আর কী। দেখলি না সেদিন কেমন জ্বালিয়ে শক্ত করে একেবারে শিক কাবারের মতো করে তুলছিল। মাগো, পরছন্দা কাবাব তৈরি করা সে-কী মুখের কথা! সমান আগুনে অল্প অল্প করে ছেঁকতে হয়, একটু স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আসতেই বাববাব আগুনের তাপ থেকে সরিয়ে নিতে হয়— তবেই না।

খোকা : (দরদ সহকারে) আপা।

কন্যা : কি রে ?

খোকা : তুমিই তৈরি করে দিও।

কন্যা : তা অমন করে অনুনয় করছিস কেন ? না চাইলেও কি তোদেব কিছু কবে খাওয়াই না নাকি ?

(আব্বাজান তীব্র দৃষ্টিতে বকরির পাঁজবেব হাড়গুলো গুণিতেছিলেন।)

আব্বা : দেখ তো মা আমার হিস্‌সা থেকে গোটা ছয়েক গ্ল্যাসি বেরুবে কি না ?

কন্যা : (টিপিয়া) হ্যাঁ, তা গোটা ছয়েক লাগসই গ্ল্যাসি তো হবেই।

পুত্র : হাড়গোড় দিয়ে আমার একটা সুপ কিন্তু চাই, আমার পেটেব জন্যে খুব উপকারী হবে।

খোকা : আর আমার এখানে হবে ভুনা মগজের—

কন্যা : দূর বেকুব, বকরির মগজের আবার ভুনা কীসের রে ?

খোকা : (ব্যথিত কণ্ঠে) হয় না!

(ক্রমশ প্রত্যেকে যে যার স্বপ্নে বিভোরচিত্তে হাত ধুইতেছে সুপশপ করিয়া জিব চুষিতেছে, শূন্য-গহ্বর মুখ অযথা চিবাইতেছে— এইরূপ স্বাপ্নিক স্তব্ধতা ছিন্ন করিয়া একবার হঠাৎ মেদবহুলা কন্যাটি হাসিয়া উঠিল)

কন্যা : তোমরা কিন্তু কেউ কলজে, গুর্দার কথা বলনি। ওটা কিন্তু আব্বাজান কাউকে আমি দেব না। পুদিনা পাতা দিয়ে কলজে-গুর্দার দোপেয়াজ—

(কন্যা তার বাক্যের মধ্য পথে সভয়ে থামিয়া গেল। চমকিয়া সকলে দেখিল, পিছনে আম্মাজান আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাস্তবে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অসংযম উল্লাসের জন্য সকলেই কেমন যেন হইয়া গেল। এ উহার দিকে চাহিল।)

আম্মা : কীসের কলজে-গুর্দার দোপেয়াজ হবে রে ? (হঠাৎ বকরিটাকে লক্ষ করিয়া) ওটার ? (সকলে নিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িল)

খোকা : হ্যাঁ, আম্মাজান।

আম্মা : দেখি (ভ্রু কুঁচকাইয়া বকরিটিকে আরো কিছুক্ষণ লক্ষ করিলেন) তোমরা কি সব পাগল হলে নাকি, চোখে দেখতে পাও না ?

খোকা : কী ?

পুত্র : এ্যাঁ।

আম্মা : (কন্যাকে) ধিংগি মেয়ে, খানার কথা শুনে নাচতে লজ্জা করে, না ? তখন বুঝি কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, না ? চোখ নেই, দেখতে পাও না, ওটা আর দু'মাস পর বাচ্চা বিয়োবে ?

আব্বা : এ্যাঁ। আস্তাগ-ফেরুল্লাহ।

আম্মা : তোমার যে কী, বুড়ো বয়সে। ছেলেদের সঙ্গে সব কথাতেই...

[বিড়বিড় করিতে করিতে আম্মাজানের ভারিক্কি প্রস্থান। বোকার মতো এ উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া প্রথমে এক দ্বার পথে পিতা অন্য দ্বার পথে কন্যা নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। একটু পবে জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং সকলের শেষে কাতর চোখে ছাগলটিকে দেখিতে দেখিতে পেটুক খোকাও গেল।

বকরিটি হতভম্ব হইয়া রঙ্গমঞ্চ আর একবার নাপাক করিতে উদ্যত হইতেই পর্দা পড়িল।]

[যবনিকা]

একটি মশা

চরিত্র

কবীর	:	গৃহস্বামী
নবাব	:	কবীরের ছোট ভাই
মিনু	:	কবীরের ছেলে
ভাবি		
নাদেরা		

[স্থান : যে-পাড়ায় এরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়।

সময় : যে-যুগের খবরের কাগজে সাধারণ মানুষের জন্যে একটিমাত্র খবরই সবচেয়ে বেশি ছাপা হতো-হিন্দু মানুষ আর মুসলমান মানুষ সুযোগ পেলেই পরস্পরের ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষছে।]

ভাবি : (হাতকাটা ব্লাউসের প্রান্তদেশে খোলা লাল টুকটুকে সুপুষ্ট বাহুতে একটা প্রচণ্ড চাটি মারে) উঃ!

নবাব : বাব্বাঃ, এত জোরে মেরেছ, বেচারা বোধহয় একেবারে থেঁতলেই মরে গেছে!

ভাবি : (নখ দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত মাংস বিন্দুতে খুঁটতে খুঁটতে) কী রাক্ষুসে কামড় রে বাবা, মনে হলো যেন এক চিম্‌টে গোস্তই উপড়ে ফেলেছে!

নবাব : তাই বলে বেচারাকে তুমি ঐ-রকম ভয়ংকর পাল্টা আক্রমণ করবে নাকি ? তোমার অত আছে, এক আধ গ্লাস ও খেলেই-বা এমন কি তোমার বয়ে যায়!

ভাবি : ফাজলামি না, তোদের এ জায়গার মতন এমন ডাকাত মশা কস্মিনকালেও আর দেখিনি।

নবাব : তোমার বাপের বাড়ির মশাগুলো বুঝি সব অহিংস-ধর্মাবলম্বী, পানি ছাড়া বুঝি ওগুলো আর কিচ্ছু ছোঁয় না। রক্ত-মাংসে বুঝি ওগুলোর একদম অরুচি!

ভাবি : জ্বি। তাই।

নবাব : এখানকার মশাগুলো সত্যি ভাবি একেবারে গুণ্ডা ক্লাস। সবসময়ে মানুষের রক্তের নেশায় ভন্ ভন্ করে ঘুরে বেড়ায়, শুঁকে শুঁকে ঠিক খুঁজে বের করবে কোথায় গোশতের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক ফুটো আছে।

ভাবি : হুম।

নবাব : বনেদি পিশাচ এ জায়গার মশা। এগুলো তোমার চামড়ার ফুটোয় শুঁড় সেঁধিয়ে দিয়ে কি-রকম চোঁ চোঁ করে রক্ত চুষতে শুরু করে দেয়! ঐ এক মুহূর্তের মধ্যে তোমার ক'গণ্ডুষ রক্ত সাবাড় করে ফেলেছে শয়তানটা কে জানে ?

ভাবি : নিজের তো গণ্ডারের খোলস কিনা, তাই অন্যের বেলায় এত ফুর্তি, এত কাব্য!

নবাব : কাব্য নয়, আমার কি মনে হয় জানো ভাবি, এ মশাগুলো যে শুধু তোমার বাপের বাড়ির নয়, তাই নয়। এর বদ্-খাসলিয়তগুলো আরো গভীর কোনো কারণবশত জন্মেছে। এখানকার মশাগুলোর এই রক্তচোষা মানুষ-খেকো প্রবৃত্তিটা নিশ্চয় এখানকার স্থানীয় কোনো প্রাকৃতিক বিকৃতিরই রূপ।

ভাবি তারপর ?

নবাব নিশ্চয় একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য এটা। বুঝলে ভাবি, আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, তোমায় যে-মশাটা এমন একটা নৃশংস কুটুস্ কামড় দিয়েছিল, ওটা নিশ্চয় নিশ্চয় জাতে হিন্দু মশা হবে! হিন্দু নাহলে তোমাকে ও-রকমভাবে কেউ আক্রমণ করে!

(মিনু হেসে লুটোপুটি)

কবীর : (মিনুর পড়ার টেবিল থেকে লাফিয়ে ওঠে) মিনু, হাসছিস কেন ?

মিনু : বাঃ কাকা অমন হাসির কথা বলল কেন তবে ? হিঁদু মশা, হি হি হি হো হো হো!

কবীর : চুপ! এটা হাসির কথা নয়।

নবাব : ওকে ছেড়ে দাও দাদা, না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছে। মিনু, এদিকে আয়।

মিনু : বল কাকা।

নবাব : হিঁদু মশা হাসির কথা নয়। হিঁদু মশা তোর মাকে কামড়েছে এটা গভীর দুঃখের কথা। বুঝলি ?

মিনু : না।

নবাব : না কিরে ? শোন আবার বুঝিয়ে বলছি।

মিনু : বল।

নবাব : তোর মা কী ? বল্ তো তোর মা কী ?

মিনু : মা ? বাঃ, মা তো মা-ই, আবার কী ?

নবাব : ধেৎ বোকা, হলো না, আবার বল্।

মিনু : মা-মা, মানুষ।

নবাব : এবারও হলো না।

মিনু : ওঃ বুঝেছি, মা তো মেয়ে মানুষ।

নবাব : উহুম, এবারও ঠিক হয়নি। কাছাকাছি হয়েছে।

(ভাবি একটু একটু হাসছে। কবীর পেছনে হাত মুঠো করে একেকবার কটমট করে নবাবকে দেখছে, আবার পায়চারি করছে।)

মিনু : (আব্বাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে মিটিমিটি দুষ্টুমি হেসে) এবার বুঝেছি।

(ফিস্ ফিস্ করে কি বলে)।

ভাবি : কী ?

কবীর : কী বলল ও ? কী বলল ও ?

নবাব : হ্যাঁ এই তো, এতক্ষণে ঠিক বুঝেছিস। মা হলো প্রধানত মুসলমান, তরপর মেয়েলোক, তারপর মানুষ, তারপর হলো কিনা মা।

(মা ও বাবা যুগপৎ বিস্ময়ের সঙ্গে ছেলেকে দেখছে)

এই তো দেখ এখন, ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, এখন আব আমার কথায় হাসি পাওয়া, তোমার বাবার মতে উচিত নয়। হিঁদু মশা, তার জাতভাই বলে পাশের বাড়ির ঐ চর্বির তৈয়েব বাঁড়ুয্যে-গিন্নিকে রেহাই দিলেও তোমার মাকে আক্রমণ করতে কোনো কসুর করবে না। এটা একটা খুব বিপদ এবং ভয়ের কথা, হাসির কথা নয়, বুঝলি!

মিনু : হুঁউম।

কবীর : হুঁম না, খুব ডেঁপোমি শিখেছ, না ?

ভাবি : ওকে খামকা বকছ কেন ?

কবীব : না বকব কেন ? আদব কবব! তোমরা মায়ে কাকায় মিলে ছেলেটাকে হিঁদু বানিয়ে ফেললেই পার ?

নবাব : না, না, বাইরের একটা লোককে ঘরে ডেকে আবার হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ কী! তারচেয়ে আমরা যখন হাতের কাছে আছি, ওকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে এমন কি আব তকলিফ হবে। কী বলিস মিনু ?

নু : তাই তো'

বীব : দু'দিন পাড়ার কতগুলো বখাটে হিঁদু ছোকরা নিয়ে দাঙ্গাবিরোধী সংগঠন করেই- (নবাবকে) তোমার চোখে তো মুসলমানমাত্রেই এখন গুণ্ডা আব-

নবাব : ছিঃ ছিঃ সে কী কথা, তুমি হবে গুণ্ডা, তওবা ! ছোবা দেখলেই যে তোমাব বুক কাঁপে! মনে নেই সেবার পল্টনে সার্কাস দেখতে গিয়ে-

কবীব : আর হিন্দুরা সব, সব দেবতা, না ?

নবাব : হিঁদু শাস্ত্র তোমার একেবারে পড়া নেই দাদা' দেবতা কি কবে হিঁদু হবে ওরা তো মানুষ নয়।

মিনু : হিহি হোহো। থুড়ি, আর হাসব না, কাকা। দেখ কাকা, মা তবু হাসছে!

ভাবি : চুপ কর্ খোকা।

কবীর : এদিকে আয় মিনু।

মিনু : মেরো না বাবা।

কবীব : কাল থেকে দু'দিন বাসার বাইবে এক পা-ও যেতে পাবিনে।

মিনু : তাবপর যেতে পারব তো বাবা ?

কবীব : দরকার হবে না।

ভাবি : কী বলছ তুমি ?

কবীর : দু'দিনের মধ্যে যা পার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি, পরশুর পর আর একদিনও এখানে থাকতে আমি রাজি নই।

নবাব : তার আগেই যদি ওরা আমাদের সাবাড় করে দেয তাহলে যাব কী করে ?

মিনু : ওরা কারা, কাকা ?

ভাবি : কী অলুক্ষণে কথা বলছিস তোরা ?

কবীর : সেটা হওয়া এমন একটা বিচিত্র কিছু নয়। কী করবে তুমি, কে বাঁচাবে তোমায়! ঘরে একটা লোক ঢুকে তোমার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েও যদি তুষ্ট না হয়, তোমার গলাটাও যদি কাটতে চায় ?

(ভাবির ভীত চিৎকার। কবীর সাহেবও একটু ভড়কে যায়। হাতে বইখাতাসহ পাশের ঘর থেকে দৌড়ে নাদেরার প্রবেশ)

নাদেরা : কী, কী হলো আপা ?

নবাব : ভয়ঙ্কর কাণ্ড, একটা এই জোয়ান হিন্দু তোমার আপার গলা থেকে হার ছিনিয়ে তারপর খোপাবাঁধা মাথাটা বামদার এক আঘাতে গর্দান থেকে চ্যুত করে দেবার ইচ্ছায়-।

নাদেরা : (ভয়ার্ত চিৎকার) আপা!

নবাব : কি চ্যাঁচাচ্ছ কেবল। কিছু হয়নি, যদি এ-রকম হয় সেকথা তোমার দুলাভাই বলাতেই তোমার আপা মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল।

নাদেরা : (আপার গলা জড়িয়ে ধরে। এদিক-ওদিক নিশ্চিন্ত চোখ মেলে ও হাঁফ ছেড়ে) ওহ তাই বলুন। আপনারও এ, কিন্তু দুলাভাইর এই বুড়ো বয়সে ও-রকম উৎকট রসিকতার বায়ু চাপল কেন বুঝতে পারছি না।

কবীব : বায়ু ?

নবাব : যা মনে করেছ তেমনও নয় কিন্তু, একেবারে সবটা ফাঁকা বানানো বাতাস নয়। সত্যি যা হয়েছিল-

মিনু : হ্যাঁ একটা-

নবাব : হাসি নয়, সত্যি একটা এসেও ছিল, আক্রমণও যে করেনি তা নয়। অমন আঁৎকে উঠো না, তেমন কিছু ক্ষতি করতে পাবেনি। শুধু তোমাব আপার অমন নধর দেহ চুষে কয়েক ফোঁটা টাটকা সুস্বাদু লাল রক্ত নিয়ে গেছে।

নাদেরা : আপা ! (ভয়ার্ত)

ভাবি : ঠাট্টা করছে, আমায় একটা মশা কামড়েছিল, তাই নিয়ে ফাজলেমি কবছে।

নাদেরা : মশা !

নবাব : হ্যাঁ, একটা জাঁদবেল হিন্দু মশা'

[যবনিকা]

নেতা

চরিত্র

হাজি রুহুল করিম	: দেশবরেণ্য নেতা, মুল্লুকের একজন প্রধান চালক
নাজিমুল হক	: হাজি রুহুল কবিমের প্রাইভেট সেক্রেটারি
মুনশী কোরেশী	: দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব প্রেসিডেন্ট
হাফিজ সাহেব	: উক্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন নেতা
শরীফ মিয়া	: উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটাবি
হাওই শার্ট-পরিহিত ব্যক্তি	: হাফিজ সাহেবের অনুচর
লম্বাকোর্তা-পরিহিত ব্যক্তি	: মুনশী কোরেশীর অনুচব
মিসেস ফিকরী খানম	: উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট

হক : (ঢুকে সোজা বোতলটা নাকের কাছে তুলে একটু শুঁকে নিয়ে) আপনার ওষুধের বোতলটা আমি আপাতত সরিয়ে রাখছি।

রুহুল : (সামলাবার চেষ্টায়) সকাল বেলা বিছানা থেকে কোনোক্রমেই আর কোমরটা তুলতে পারছিলাম না। ব্যথায় একেবারে অবশ হয়ে রয়েছে। এদিকে ওদেরও প্রায় আসার সময় হয়ে এলো। ভাবছিলাম একটু গিলে নিলে হয়তো দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

হক্ : ভুল ভেবেছিলেন। এবং নিয়ম ভঙ্গ করেছেন।

রুহুল : তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, না ? এখনও সোজা হয়ে বসতে পারছি না-

হক : সেটা কতটা বাতের আর কতটা বোতলের আপনি নিজেই ভালো জানেন। কিন্তু সন্ধ্যের সময় কাউন্সিল মিটিং, একটু পর আসল রুই-কাতলাবা এখানে এসে জড় হচ্ছেন- এ-রকম অবস্থায় আপনার সম্পর্কে আমারও একটা দায়িত্ব আছে। আপনাকেও আর কেউ কোমরে গামছা বেঁধে কোদাল মারতে বলছে না। কোমর তুলতে না পারেন, চিৎ হয়ে পড়ে থাকুন। মাথা ঠিক রেখে নাকে-মুখে কথা বলে যান, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রুহুল : হুম্।

হক্ : মনটাকে সব সময় অত কোমরের নিচে ফেলে রাখবেন না। টেনে তুলে আরেকটু ওপরেও ঘোরান-ফেরান। নইলে যে গেরো বেঁধেছে তাতে আমার মতো দশটা সেক্রেটারিও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

রুহুল : থাক্ থাক্ আর বোঝাতে হবে না। একদিকে বাতের ব্যথা, অন্যদিকে কাউন্সিল মিটিং-সারারাত ঘুমুতে পারিনি। একবার এসে খোঁজও নিলে না। সন্ধ্যের পর কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে।

হক্ : আপনার কাজেই বেরিয়েছিলাম।

রুহুল : প্রভুর জন্যে এত কাজই করছিলে যে সারা রাতের মধ্যে একবার বাড়ি ফিরে যাবার ফুরসতও পেলে না ?

হক্ : খোঁজ নিয়েছিলেন নাকি ?

রুহুল : রাত বারটার পর প্রতি দশ মিনিটে তোমাকে একবার রিং করেছি। প্রত্যেক বারই তোমার চাকর ফোন ধরেছে।

হক্ : ঘুম যদি না-ই আসছিল তবে দু'চার বার আজকের বক্তৃতার খসড়াটায় চোখ বুলিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন।

রুহুল : দেখো হক, তোমার মতো অত ডিগ্রি আমার নেই। বিলাত গিয়ে মোটা মোটা রাজনীতির বই ঘেঁটে কোনো পরীক্ষায় আমায় কোনোদিন পাশ করতে হয়নি। কিন্তু তবু আমি রাজনীতি করি, করে বড় হয়েছি, পয়সা করেছি।

এবং সে পয়সার জোরে তোমার মতো লোককে নিজের কাজে খাটাচ্ছি।

হক্ : খাঁটি কথা বলেছেন। আমিও নিমকহারাম নই। আপনার স্বার্থ আমার স্বার্থ। আপনি শুধু আমার প্রভু নন, আমার মান আমার প্রাণ; ঠিক এজন্যেই আপনার যে-কোনো বিপদে আমি এত কঠিন এবং রূঢ়। আপনাকে বিপদমুক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই তখন আমল দিতে রাজি নই। এতটা সতর্ক বলে আমার হিসেবেও সাধারণত কোনো ভুল হয় না।

রুহুল : তোমার কথা শুনলে মনে বড় বল পাই। সাহস পাই। তোমার বেয়াড়া কথাবার্তাগুলোও সেজন্যে এত সহ্য করি। তোমার পবামর্শ মতো নিজের বাড়িটাকে পর্যন্ত একটা গোলকধাঁধা করে গড়েছি। এর কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকলে কোথায় গিয়ে পড়ব, নিজেও সব সময় তা ঠিক করে উঠতে পারি না।

হক্ : পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের বাড়ির হদিস আপনার জানা নেই বলে আপনি এত অবাক হচ্ছেন। হাল জামানার রাজনীতি এত ঘোরাল ব্যাপার যে সেখানে বাদশাহী করতে গেলে নিজেব বাসগৃহকেও বহস্যপুবী বানাতে হয।

রুহুল : তোমার কথা মারপ্যাচেব মতো, না ? কিন্তু আমি অত থিওরি বুঝি না। আমি চাই মুনাফা, টাটকা এবং তাজা।

হক : রাজনীতির লেনদেনে এত তাড়াহুড়ো করলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি দিতে হয়।

রুহুল : তা হোক্। তবু এ-রকম ফাঁকা সবুর আমার বরদাশ্‌ত হয় না আমি দরবেশ নই, আমি লিডাব। তুমি আমাব পীর নও, সেক্রেটারি, তোমাব আইন-কানুনের মুণ্ডবে আমার জীবনেব সব ফুর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব আমি আব মানব না।

হক : কী মানবেন না ?

রুহুল : তোমাদেব এসব নযা রাজনীতিব হাদিছ-ফেকা! আজকে কাউন্সিল মিটিং তাই আজকে আমার বরাদ্দ বোতল বন্ধ! কাবণ, তোমার মতে কাউন্সিল মিটিং হলো সজাগ বুদ্ধিব লড়াই-পরীক্ষা। কালকে জনসভা, কাজেই তোমাব নির্দেশ হবে আজ বাতেও আমি যাকে খুশি তাকে ঘরে ডাকতে পারব না। কারণ তোমার মতে একা একা নিশি যাপন করলেই আমার নয়ন-বদন ফুঁড়ে নুরানী রোশনাই বেরুবে যা দেখে বেকুব জনতা বেহুশ হয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলবে। মানব না, এসব আমি মানব না।

হক : কী করতে চান তা হলে ?

রুহুল : আমি এখনই টেলিফোন করব ?

হক : কাকে ?

রুহুল : মিসেস ফিকরী খানমকে।

হক : আপনি অপ্রকৃতস্থ, আজ সকাল বেলাতেই আপনার মাথার ঠিক নেই।

রুহুল : বল মাথা ছাড়া আজ সকাল বেলা আমার শরীরে অন্য কোথাও কিছু ঠিক নেই। কোমরে ব্যথা, ঘুম নেই। তার ওপর তুমি যে এসেই বোতলটা

কেড়ে নিয়েছ। মাথা আমার ঠিক থাকবে কী করে ? সারারাত ফোন করে করে হয়রান হয়ে গেছি, তোমারও কোনো পাত্তা নেই।

হক : আমি এখানেই ছিলাম।

রুহুল : মানে ?

হক্ : কোন্ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম লক্ষ করেননি বোধহয়। ঐ পুবের ঘরটায় ছিলাম। আপনার উচিত ছিল একবাব নিজের বাড়িতেই আগে খোঁজ করা।

রুহুল : কী করছিলে এখানে ?

হক্ : নানা কাজে রাত হয়ে যাওয়ায় ভাবলাম এখানেই থাকি। কেন, এ ব্যবস্থাও আর আজকের নতুন কিছু নয়!

রুহুল : না, নতুন কিছু নয়। ববঞ্চ বেশি ঘনঘন হচ্ছে বলতে পার। আমার মঙ্গলের জন্য রাত-বিবাতে তুমি যে আমাকে পাহারা পর্যন্ত দাও তা আমি সন্দেহ করতাম— তবে, জানা ছিল না। আই-বি ডিপার্টমেন্টে যদি কোনো বড় চাকরির প্রতি লোভ থাকে তবে জানিও, সুবিধেমত এক সময় জুটিয়ে দেব। যাক, এখন মিসেস ফিকরী খানমকে একবাব ফোন করে জিজ্ঞেস কবতো কাল সাবারাত উনি কোথায় ছিলেন ?

হক : কোনো ভদ্রমহিলাকে ও-রকম প্রশ্ন করা উচিত নয়। নিরাপদ নয। বিশেষ করে, আপনার মতো পজিশনে থেকে। তা ছাড়া সে অধিকার আপনাব নেই।

রুহুল : একশবার আছে। তুমি আমায় চটিও না হক। দেশের বৃহত্তম বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব আমি হবু সভাপতি। সেই প্রতিষ্ঠানেব মহিলা শাখাব প্রেসিডেন্ট কোথায় রাত কাটায় সে খোঁজ নেয়ার অধিকার আমাব হাজাব বার আছে। মাঝ রাতেব পর কম কবে হলেও আমি তাকে দশবাব ফোন কবেছি। প্রত্যেকবারই জবাব পেয়েছি উনি বাড়ি নেই।

হক্ : ফোন ধরেছিল কে ?

রুহুল : ছুঁড়িটা। ওর সেই ইরানী চাকরানীটা। সে ছুঁড়ি আবার টেলিফোন কানে দিয়ে এখনও ভালো করে কথা বলতে পারে না। কানে নাকি শুড়শুড়ি লাগে। আধখানা কথা বলে বাকিটুকু শুধু খল্ খল করে হাসে।

হক : আপনি ওকে কী জবাব দিলেন ?

রুহুল : বললাম, তোর কথা ফোনে কিছু বোঝা যায় না।

হক : তাই আপনি রাত দুটোর সময় ওকে সবাসরি দাওয়াত করে বসলেন আপনার বাড়িতে এসে আপনার কানে কানে বাকি কথাগুলো বুঝিয়ে বলার জন্য! চমৎকার!!

রুহুল আমি জানতাম তুমি আমাকে পাহাবা দাও। সবই যদি দেখে থাকবে, তবে তখনই বাধা দিলে না কেন ?

হক কাউন্সিল মিটিং-এর আগের রাতে লিডারদের বাড়ির ওপর কতলোক নজর রাখে খোঁজ রাখেন তার ? তখন যদি বাধা দিতাম, তাহলে জানাজানির কিছু কি আর বাকি থাকত ভেবেছেন ?

রুহুল এ বাড়িব নক্‌শা তোমার নিজ হাতে তৈরি। এ বাড়িতে কখন কারা ঢোকে বার হয় তার সব আনাগোনার খবরই যদি বাইরে থেকে লোকে এত সহজে মালুম করতে পারে, তা হলে সে দোষ তোমার। আমার তরফ থেকে কাঁচা কাজ পাবে না। কোন্ খুপরি দিয়ে ঢুকলে সহজে চোরা সিঁড়ি পাবে, তাও ছুঁড়ি ভালো করে জানত, টুপ করে ঢুকে পড়েছে।

হক : ওহ' ব্যাপারটা তাহলে নতুন কিছু নয়। এতটা আমারও জানা ছিল না।

রুহুল . শেখ, শেখ, শেখ। তোমারও শেখার অনেক কিছু এখনও বাকি আছে। অনেক লাইন আছে, যেখানে তোমাকেও আমি অনেক কিছু শেখাতে পারি।

হক্ : তা হলেও সব মামলা চুকেই গেছে। এখন আবার সাত সকালেই মিসেস ফিকরী খানমের খোঁজ করছেন কেন ?

রুহুল : আসল কথা হলো এই যে, প্রভুকে যদি কাবু করতে চাও তবে আগে তার গোলামকে ধরো। বেগমেব বেলায় বাঁদী। ফাবসি বয়েতটা আর বললাম না। বললেও বুঝতে পারতে না।

হক : আমাব-আপনার চেয়ে ফারসি শতগুণে ভালো জানেন, এমন লোকই আসছেন। কোন্ বয়েতে তাকে কাবু করবেন এই বেলা সেটাই শোনাতে শুরু করুন। জানালা দিয়ে এইমাত্র তাঁরই কিস্তি টুপিব ধজা দেখলাম।

রুহুল : কে ? মুন্সী কোরেশী ? কিন্তু এত সকালে ?

হক : নয়া রাজনীতি। আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে। বিকেলে জনসভা, কিন্তু তার আগের রাতে কাউন্সিল মিটিং। তারও আগে বিশিষ্ট নেতৃবর্গেব ঘরোয়া বৈঠক। তারও আগে এক এক করে নেতায় নেতায় রুদ্ধদ্বাব কক্ষে নিভৃত আলাপ। সেই কেস্‌সার একেবারে গোড়ায় মওলানা কোরেশীর প্রথম আবির্ভাব। বাকি সবাই নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে এসে জুটবেন।

রুহুল : সারারাত ধরে এ কাজেও সুতো টেনেছ নাকি ?

হক্ : কিছুটা। আমি আপনার নুন খাই। তবে বুনটের আসল নকশা আপনার হাতে। যেমন চালাবেন তেমনি হবে। মুন্সী কোরেশীর খুঁটি, প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই, উনি তার সভাপতি বনে বনে এতদূর এসেছেন। আর আপনার তরফে আসল জোর, আপনার হালের সরকারি ক্ষমতা। বুঝে শুনে মাকু চালাবেন। তবে আমার মনের হয় আগে-ভাগে কোরেশী সাহেবকে বুঝতে না দেয়া যে এইবার আপনি নিজেই সভাপতি পদের জন্য-

রুহুল : বুঝেছি। কিন্তু এইবার মুন্সীকে বোঝাতে পারলে হয়।

(হক দরজার দিকে দু'কদম এগিয়ে যায়)

হক্ : আসুন, আসুন মুন্সী সাহেব। উনি এ ঘরেই আছেন।

মুন্সী : (প্রবেশ করে) আচ্ছালামো আলাইকুম।

রুহুল : ওলাইকুম ওয়াচ্ছালাম। আসুন, আসুন। মাফ ক[illegible] কোমবের বেদনার জন্যে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। (হক্ ভেতরে চলে যা[illegible])

কোরেশী : বসো, বসো। তাতে কী হয়েছে ? তবে তোমাদের দেখলে দুঃখ হয়। এই বয়সেই শরীরের কী হাল করেছ। কেবল বসে বসে লাল-নীল ওষুধ খেলে সেহেদ ঠিক থাকবে কি করে ? একটু ওঠবসও করতে হয়!

রুহুল : একেবারেই যে করছি না সে-রকম ভাবছেন কেন ? রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা হাতে পেলে কেবল শুয়ে শুয়ে দিন কাটান যায় এ ধারণা আপনার ভুল।

কোরেশী : হতে পারে। হয়তো বেশি ওঠবস্ করেই কোমর তোমার অকেজো হয়ে পড়েছে। বুঝলে মিঞা সবই পরিমিত এবং নিয়মিত হওয়া দরকার।

রুহুল : আজ একেবারে সকাল বেলাই ওয়াজ শুরু করলেন যে! অনেক হেঁটেছেন। মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে গেছে। এই বয়সে অন্ধকার থাক্‌তে বিছানা ছেড়ে সারা সকাল এত হাঁটাহাঁটি করেন কী করে ভেবে অবাক হয়ে যাই।

কোরেশী : বেশি দূর হাঁটিনি। একটা জায়গার চারপাশ একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। প্রায়ই আসি। নিজের অজান্তেই এসে পড়ি। কী যেন আমাকে টেনে নিয়ে আসে।

রুহুল : কোথায় ?

কোরেশী : বলতো ?

রুহুল : পুরনো পুকুর পাড়ের ঐ কালো মাজাব ? হাসছেন যে ?

কোরেশী : বলতে পারলে না। নয়া সড়কের ওপর তোমার এই নয়া ইমারত। রোজই তোমার বাড়িটাকে চারধার থেকে ভালো করে দেখি। দিনের বেলায় লোকে কী বলবে এই ভয়ে খুব ভোরে যখন একটু একটু আঁধার থাকে তখন আসি। তোমার বাড়িটা দেখি। বেড়ানোও হয়।

রুহুল : দেখে কী মনে হয় ?

কোরেশী : জটিল। সাদাসিধা কিছু নয়। যখন আবছা আলোতে দেখি তখন আবব্য উপন্যাসের নিশিঘেরা পুরী মনে জাগে। আলোতে মনে হয়, এ কোনো কুঠি নয়, দুর্গ।

রুহুল : বয়স আপনার কল্পনার জৌলুসকে একটুও ম্লান করতে পারেনি দেখছি।

কোরেশী : চোখেব জ্যোতিকেও না। সাদামাটা কাণ্ডজ্ঞানকেও নয়। এতবড় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচন কবার বেলায় তারা যে এত দিন একবার ভুল করেনি এত তার আরেকটা প্রমাণ।

রুহুল : কী দেখেছেন আপনি ?

কোরেশী : তোমার ঐ পশ্চিমের একটা লতা-ঢাকা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, এক টুকটুকে পরী উড়ে চলে গেল। দিশি পরী হলে নিশ্চয়ই পরে চলত, ধরে ফেলতে পারতাম। মনে হলো এটি বিদেশী, ডানা মেলে চলে। ইরান তুরানের হরিণ বোধহয়।

রুহুল : আপনি পাকা শিকারি। ঠিকই ধরেছেন। ঝোপেঝাড়ে আর পেটাবার দরকার নেই, কী বলতে চান সরাসরি বলে ফেলুন।

কোরেশী : তোমার সমালোচনা আমি কবতে চাইনে।

রুহুল : আপনি মুরুব্বি লোক, কবলেও আমি কিছু মনে করব না।

কোরেশী : বেশ আমি অবশ্য আমার নিজের সুখ-সুবিধের চেয়ে বড় করে দেখছি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে, আমার কওমকে।

রুহুল : আপনি খাঁটি লোক। আপনি সব সময়েই বলে এসেছেন ইমানই আপনার একমাত্র সম্বল। (ড্রয়াব খুলে বোতল-গ্লাস বের করবে)

কোরেশী : ওটা কী ?

রুহুল : ওষুধ। কোমরেব ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। সেক্রেটারি ঢুকলে আবার গোলমাল কববে। আপনি বলতে থাকুন এই অবসরে আমি কিছুটা নিশ্চিত মনে খেয়েনি।

(ঢেলে শুরু কববে)

কোরেশী : খাও, যত খুশি খাও। আমি তোমার সমালোচনা কবতে আজ আসিনি। তবু এইটুকু তোমাকে জানাতে এসেছি যে আজকেব সন্ধ্যেব কাউন্সিল মিটিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সব কিছুই একটু গভীবভাবে তলিয়ে বিচাব কবে তাবপর তুমি তোমাব মত দেবে।

রুহুল : মদ। লাহুওলা! আপনাকে মদ দেব ? এই সক্কাল বেলা ?

কোরেশী : বুঝতে পারছি আর দু'এক গ্লাশ পর আমাব কোনো কথাই তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে না। তাড়াতাড়ি সব বলছি আগে ভালো কবে শুনে নাও।

রুহুল : আরজ করুন।

কোরেশী : আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেব ঘরোয়া বৈঠক বসবে। কাউন্সিল মিটিং-এ কী ঠিক হবে তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সেখানেই গ্রহণ করা হবে। তোমাব কাছ থেকে আমি পরিষ্কার বুঝে নিতে চাই প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটাবির পদেব জন্য কে কে তোমাব পূর্ণ সমর্থন পাবে।

রুহুল : প্রতিষ্ঠানেব কোনো পদে আমি অধিষ্ঠিত নই। অতএব পদাধিকার বলে প্রথম প্রস্তাব করার অধিকার আপনার। গত বিশ বছর ধরে আপনি বুঝি বারবাবই সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন ?

কোরেশী : হ্যাঁ। এবং আরেকবার হতে চাই। প্রতিষ্ঠানের খাতিবে, কওমেব খেদমতেব জন্য। এবং সেই তোমার নিরাপত্তার জন্যও বটে।

রুহুল : উত্তম। শুভ কামনার মুখে এক চুমুক চেখে নিলে হতো না। মুন্সী সাহেব ?

কোরেশী : না, এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য।

রুহুল : সে কি মুন্সী সাহেব ? আপনিও শেষে সাদা পানি খাওয়া ধরলেন ? বিশ্বেস করতে বলছেন নাকি ?

কোরেশী : ভুল বুঝেছ। তোমাব কাছ থেকে লুকোবার আমার কিছু নেই। তবে আমি হিসেব কবে চলি।

রুহুল সে আপনার ব্যবসার উন্নতি দেখে আঁচ করা যায়।

কোরেশী : ব্যবসা ছাড়াও তুমি হয়তো খেয়াল না কবতে পারো কিন্তু দেশব্যাপী আমাকে এখনো প্রতিষ্ঠানেব সভাপতি হিসেবেই জানে।

রুহুল : জীবন আপনার আর কতটুকু বাকি আছে। তাকে যদি আবার ভাগাভাগি করেন তা হলে কারো জন্যেই আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তাছাড়া আমার এই নিভৃত কক্ষে একটু পান করলে, আপনার ঐ পাবলিক দূরে থাকুক কাকপক্ষীও রা করবে না।

কোরেশী : তোমার ফালসফার সঙ্গে আমার কোথায় অমিল সে তত্ত্বই বোঝাচ্ছিলাম। অনেক ঠেকে তবে শিখেছি। যে নীতি মঞ্চ থেকে বড় গলায় অষ্টপ্রহর জাহির করো, অষ্টপ্রহরই তাকে মেনে চলতে হবে, এমন কথা আমি বলব না কিন্তু অষ্টপ্রহরই যদি তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলো, তবে অভ্যেসে ঢিলেমী এসে যাবে। মনের মধ্যে অসতর্কতা বাসা বাঁধবে। পাবলিক শত হাদা হলেও তখন খপ্ করে একদিন ধরে ফেলবে।

রুহুল : আপনাকে পারবে না।

কোরেশী : কারণ, জীবনটাকে আমি ভাগ করে চলি। যে ভাগ জনতার তাতে কখনো হাত দেই না দেবও না।

রুহুল : জনতার ভাগ কোন্‌টা ?

কোরেশী : ফজর থেকে মাগরেব। মাঝখানের সময়টুকু ফালতু। তারপর আবার এশার থেকে ফজর আমার। তখনকার আমাকে তুমি যদি কোনো অনুরোধ করো ফেলব না।

রুহুল : একটি সকালেও কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না ?

কোরেশী : এটুকু যেন বুঝতে তোমার কোনো কষ্ট না হয় এ জন্যই এত কথা বলা। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইজ্জত-কুয়ত আমার সংযত সতর্ক বোধবুদ্ধিব হেফাজতে যত নিরাপদ থাকবে এবং বাড়বে, এমন আব কারো বেলায় হবে না। আর সবাই নড়বে, টলবে। আমি অটুট থাকব। থাকতে জানি। থেকে এসেছি।

রুহুল : আর ফিকবী খানম ?

কোরেশী : না, মানতে পারব না। তাকে তোমাব দবকার তা আমি জানি। কিন্তু তাই বলে একেবারে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট করে না পেলে তোমার চলে না এতটা আমি মানতে রাজি নই। মূল প্রতিষ্ঠানের আমি হবো দাড়ি-দোলান সভাপতি, আর তারই এক শাখায় তোমাব পোষা পাখি পেখম তুলে নাচবে-লোকেব চোখে কওমী প্রতিষ্ঠানকে একটা সার্কাস পার্টি করে তুলতে চাও নাকি ?

রুহুল : ভুল কবছেন। চিড়িয়া এখনো পোষ মানেনি। বশ কবতে পাবলে কি আর প্রেসিডেন্ট কবে বাখার কথা তুলতাম ?

কোরেশী : এটা কি তাহলে একবাবই সাময়িক ব্যবস্থা ?

রুহুল : খুবই।

কোরেশী : মানে, আমি-তুমি-তুমি-মানে তোমার পক্ষে অন্য কোনো বকম পথ বেছে নেয়া কি সম্ভব নয় ? এতবড় একটা সরকাবি ক্ষমতা তোমাব হাতে। খামো-মোনো করে কী ?

রুহুল : আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না মুন্সী সাহেব এ ঠিক জাতের মেয়ে নয়

যে! বড় খান্দানের মেয়ে, অনেক উচু তব্‌কার। টাকাব বস্তার সিঁড়ি ফেলে এ বান্দা কেবল তার নাগাল পেয়েছে। বাকি মদদটুকু আপনাকে করতে হবে। মূল সভাপতি হিসেবে আপনার নাম আমি সমর্থন করব। মাথা নিচু করে অত ভাবছেন কী ?

কোরেশী : সরকারি ক্ষমতা তোমার। ফিকরী খানম তোমার। আমি বুড়ো হব 'সভাপতি'। মহিলা শাখার ফিকরী খানম। (ভাবে)

রুহুল : আমরা সবাই গণতন্ত্রের পূজারী।

কোরেশী : আমি রাজি! ফিকরী খানম যাতে মহিলা শাখার সভাপতি হয় সে প্রস্তাব আমি করব।

রুহুল : আপনার মুখ থেকে সে-কথা উঠলে কারো মনেই আর কোনো প্রশ্ন জাগবে না। আর আপনি যাতে মূল সভাপতি হন তার প্রচার আমি চালাব। তবে কাউন্সিল মিটিং-এর আগে পর্যন্ত প্রকাশ্যত আমরা পবস্পবেব বিবোধী-যেমন ছিলাম।

কোরেশী : বেশ তোমার সরকারি ক্ষমতা যাতে অটুট থাকে পার্টি থেকে তাব ব্যবস্থা আমি কবব।

রুহুল : ওয়াদা পাক্কা।

কোরেশী : পাক্কা।

রুহুল : একটু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। শুকনো ভিটেতে পাকা কাজ হয় না। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে ? এ-রকম একটা শুভ সঙ্কল্পের মুখে পুরোনো নিয়ম না হয় একটু ভাঙ্গলেনই।

কোরেশী : আজ ভোর রাত থেকেই তুমি আমার নিয়ম সংযম ওলট-পালট কবে দিচ্ছ। গত দশ বছবের মধ্যে সূর্যাস্তেব আগে জোয়ান মেয়েছেলে নিয়ে কোনোদিন এত আলোচনা করিনি।

রুহুল : ধুয়ে ফেলুন। একগ্লাস ঢেলে দিয়ে গলাটা একেবারে সাফ করে ফেলুন।

কোরেশী : সবটা গিয়ে জমবে পেটের মধ্যে। দাপাদাপি শুরু করবে সাবা শরীরে। রাস্তায় বেরুব কোন্ সাহসে ? যাকে তাকে যদি ফিকরী খানম বলে মনে হয়, তখন ? কিম্বা ইরান তুরানের হরিণ (দেখে) রঙ্গটাতো বড় খাসা!

রুহুল : গন্ধটা আরো ভালো।

কোরেশী : উ-ফ্। বেড়ে!

রুহুল : আরো কাছে নিয়ে দেখুন।

কোরেশী : দেখি দাও। একটা কথা দিয়ে নাও আমাকে।

রুহুল : বলুন।

কোরেশী : এক চুমুকে আমি সবটা খেয়ে নেব। তারপর আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াব না। কিন্তু যে পথে এসেছি সে পথ দিয়ে নয়। কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাক এ আমি চাই না।

রুহুল : উত্তম।

কোরেশী : যে দরজা দিয়ে বেরুলে একেবারে তোমার বাড়ির পেছনের কুঞ্জবনে গিয়ে হাজির হওয়া যায় সে দরজা আমায় দেখিয়ে দেবে।

রুহুল : এই দক্ষিণের দরজা। ঢুকে সোজা সামনে এগিয়ে যাবেন। ডাইনে বাঁয়ে তাকাবেন না, ঘুরবেন না।

কোরেশী : না। হাতে অত সময় নেই আজ।

(নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে ঢুকে দবজা টেনে দিয়ে অদৃশ্য)

(পর্দার আড়াল থেকে আস্তে বেরিয়ে হাততালি দিতে থাকে এক মধ্যবয়সী নেতা। পোশাক-পরিচ্ছদে একেবারে নিখুঁত সাহেব।)

সাহেব : গুড। আপনাদের মধ্যে কে সভাপতি হবেন, ফয়সালা এত চট্ করে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কার যে যোগ্যতা বেশি তা আমি পর্যন্ত এতক্ষণ কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। অবিকল এক নমুনা!

রুহুল : তুমি ! হাফিজ! তুমি এখানে কী করে এলে ? কখন ঢুকেছ ? ঢুকলেকী করে ?

সাহেব : আপনার ঐ সেক্রেটারি ছোঁড়া বুদ্ধিমান। কিন্তু সে জানে না যে যারা ডালে ডালে ঘোরে তাদের পেছনে পাতায় পাতায় ঘোরার লোকও থাকে। এ বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ করলাম যে সিঁড়িতে সিঁড়িতে আমার আরোহণের পথ রুদ্ধ। কাজেই পাইপের পথ গ্রহণ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

রুহুল : অর্থ ?

সাহেব : ভোররাত্রি থেকে দেখি আপনার বাড়ির চার ধাবে মুন্সী সাহেব ঘুরঘুর করছেন। তখনি ঠিক করলাম যে উনি যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা মনস্থ করেছেন তখন আমাকে অন্য পথে আরো ওপরে উঠে ওঁর ওপর নজর রাখতে হবে। সেই পথেই এখানে ঢুকেছি। তবে কেমন করে যে এ পর্দার পেছনে এসে পড়লাম তা নিজেও ঠিক মালুম করতে পারিনি। আপনার এই স্বপ্নপুরীর দুয়োর-জানালা, সিঁড়ি-সুড়ং একদিনে কেমন করে বুঝে উঠব ?

রুহুল : বসো, ধরো। (কিছু ঢেলে দেয়)

সাহেব : (ঠোঁট দিয়ে একটু চেঁটে দেখে) আপনি এ করছেন কী ? এ যে আগুন! মুন্সী সাহেবকে আপনি এ জিনিস খাইয়ে দিলেন ?

রুহুল : ভয় নেই। মুন্সী সাহেব অত কচি নয়।

সাহেব : (গ্লাসটা সাবাড় করে) মরুক সে! আমি বাবা ওসব বুজরুকির মধ্যে নেই। আমি আপনাকে এই শেষবারের মতো জানিয়ে দিচ্ছি ঐ মুন্সী যদি সভাপতি হয় তবে আমি অনেকের ওপর নিশ্চয়ই শারীরিক হামলা চালাব।

রুহুল : প্রথমেই অত উত্তেজিত হয়ে পড়লে রাজনীতি চলে না। আপোষের রাস্তা সব সময় কিছু না কিছু থাকে।

সাহেব : মুন্সীকে আমি বরদাশ্ত করব না।

রুহুল : উত্তম, আমাকে দলে পাবে।

সাহেব : কিন্তু আপনি যে একা আসতে রাজি হবেন তা আর বিশ্বেস হয় না। ফিকরী খানম- তাকেও আমি আর সহ্য করব না। মহিলা শাখা-বেফজুল। মহিলা

শাখা আমি সহ্য করব না।

রুহুল : এটা তোমার অন্যায় আব্দার। প্রতিষ্ঠান গড়লে তার দু'চারটা শাখা প্রশাখা রাখতেই হয়।

সাহেব : তার জন্য মহিলা শাখাই করতে হবে তার কী মানে আছে ? ঐ হাত-পা কাঁপা, দাঁত-নড়া বাহাত্তুরে মুন্সী কি মহিলাদের শাখা দিয়ে মেসওয়াক বানাবে না-কি ?

রুহুল : সিঁড়িতে শরিফের গলা শুনতে পেলাম। ও ঢুকে পড়ার আগে অদৃশ্য হতে চাইলে এখনি রওনা হও। যতদূর উঠেছ ততদূর নামতে হবে কিন্তু!

সাহেব : এত কাঁচা লোক মনে করবেন না আমাকে। পাইপের পথে ফিরছি না। মুন্সীকে অনুসরণ করে ঐ পেছনের সিঁড়িই ধরব। তবে যাবার আগে আপনাকে শেষবারের মতো বলছি...

(বলতে বলতে দরজা খুলে মুন্সীর পথে অদৃশ্য হবে। দরজা বন্ধ হবার প্রায় সাথেই নেপথ্যে একটা হাঁক শোনা যাবে- "ইয়া হাক্।" উত্তর ভেসে আসে "গোলাম হাজির হ্যায়, আলামপনা।" তারপর অস্পষ্ট কথোপকথন ধ্বনি)

রুহুল : (বিড় বিড় করে) সেরেছে! আজ বোধহয় ঘুম থেকে উঠেই পিপে ভর্তি করে নিয়েছে। হবে না কেন ? মুন্সী যেমন সভাপতি এ ব্যাটা তেমনি তার জেনারেল সেক্রেটারি।-এসো, এসো মিয়া সেই সকাল থেকে তোমার জন্য এন্তেজার করছি। কি খবর শরিফ মিয়া ? এত দেরি যে ?

শরীফ : দেরি! দেরি কীসের ? বরঞ্চ একটু আগে এসে পড়েছি। আশেপাশে দু'চারজনকে লক্ষ করলাম খামোকা দোকান হোটেলে বসে মিনিট গুনছে। সবাই একেবারে যথাসম্ভব সময়মত হাজির হতে চায়। মতলব বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না। কিছু লোহা-লক্কড়ের জোগাড় রাখব ?

রুহুল : না, অতটা দরকার হবে না। এ ছোট ঘরোয়া বৈঠক। তোমরা দু'একজন একটু হাত-পা নাড়লেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শরীফ : ঐ সাহেব বুঝি আপনাকে খুব শাসিয়ে গেছে, না ?

রুহুল : দু'রকম শাখাই রাখা হবে এমন প্রস্তাবও করেছি আমি ওকে। মানতে চায়নি। আমতা আমতা করেছে।

শরীফ : এমন শিক্ষা আমি একদিন দিয়ে দেব বাছাধনকে আর কোনো শাখাতেই চড়তে হবে না। আর আপনাকে বলি স্যার, শাখা-প্রশাখার এত জঞ্জাল সৃষ্টি করে লাভ কী ? আপনার আমার দরকার হলে -সরাসরি- সেটা-

রুহুল : তোমার দরকার মানে ? কথাটা নতুন শুনলাম।

শরীফ : আস্তাগফেরুল্লাহ্। কী যে বলেন স্যার! ও একটা কথার কথা বললাম। ফিকরী খানম আমার কে ? তা ছাড়া আপনি আর আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি তাকে যেমন করে পাহারা দিয়ে বেড়ান তাতে সাধ্য কি যে রেঞ্জের মধ্যে ঘেঁষি ?

রুহুল : তাইতো এখনো তোমাকে কিছু মিত্র হিসেবে পাচ্ছি। শুনেছি, ফিকরী খানমের কাছে যারা একবার এসেছে তারা কেউ আর ফিরে যেতে পারেনি। ফিরে ফিবে আরো কাছে আসতে চেয়েছে বারবার।

শরীফ : (একগ্লাস ঢেলে সাবাড় করে) বোতলগুলো সরান। সবাই বোধহয় এসেছে (পকেট হাতড়ে) আরে, চাবিটা কোথায় রাখলাম ওহ্।

রুহুল : চাবি! কিসের চাবি!

শরীফ : ঐ পেছনের সিঁড়ির দরজার। আমি একবার আপনার কুঞ্জবন থেকে ঘুবে আসি। বৈঠকের আগে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে রাখা দরকাব।

রুহুল : যাও, চাবি না হলেও চলতো। দরজার লক্ ভোর রাত থেকেই খোলা আছে।

(ততক্ষণে শরীফ প্রস্থান করেছে)

(হক্ প্রবেশ করে)

হক্ : সবাইকে সরাসরি এ ঘরেই নিয়ে এলাম স্যাব।

রুহুল : বেশ কবেছ।

(প্রথমে মুন্সী সাহেব। চোখমুখ অসম্ভব বকম থমথমে। যান্ত্রিক সালাম গ্রহণ কবে কলেব পুতুলেব মতো আসন গ্রহণ কবে। তার পেছনে ঢুকলেন হাফীজ সাহেব। মাথার হ্যাট উল্টো করে পরা। শিস্ দিতে দিতে ঢুকছিলেন হঠাৎ কেতাদুরস্তভাবে মাথা নুইয়ে নুইয়ে নিজের আসনে গিয়ে গ্যাট হয়ে বসেন।

আবো দু'জন লোক প্রবেশ করবে যারা মাতাল নয়। একজনের পরনে হাওযাই সার্ট আরেকজনের লম্বাকোর্তা। হাওয়াই সার্ট গিয়ে বসবে সাহেবের পাশে এবং লম্বা কোর্তা মুন্সী কোরেশীর কাছে। সকলেব শেষে শরীফ। সে বসতে গিয়ে চেয়াব সুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তাবপব-)

কোরেশী : (হক্‌কে) দরজাটা বন্ধ করে দাও।

হক্ : সবাই যে এখনো আসেননি।

কোরেশী : আসার দরকার নেই।

সাহেব : না আসে যেন তার ব্যবস্থাটা করে এসেছি।

শরীফ : এ্যাঁ! সে-কী কথা। খুনটুন্ কবে এসেছেন নাকি ?

সাহেব : না এখনো করিনি। সামনে কবব। দরকার হলে। জাতির জন্যে, কওমের জন্যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে।

রুহুল : মারহাবা, মারহাবা। (হক্‌কে) এরা কি বক্তৃতা দিতে শুরু করে দিয়েছে নাকি। কিন্তু মিটিং শুরু হলো কখন ? সভাপতি কে ?

হক্ : ব্যস্ত হবেন না। নিয়মমতো কিছুই এখনও আরম্ভ হয়নি।

কোরেশী : নিয়মমতো কিছু হবাব দবকারও নেই।

সাহেব : হতে আমি দেব না।

শরীফ : এতো দেখছি শান্তিতে কাজ এগুতে দেবে না। গোলমাল দাওয়াত করছে। (রুহুলকে) আপনি কিন্তু আমাকে পরে দোষ দিতে পারবেন না।

রুহুল : না না, সে কী কথা। ওসব এখনি শুরু, করতে হবে নাকি ? হক্ এসব কী শুনছি ? আরো লোকজন ডাকলে হতো না ?

কোরেশী : না। হতো না। দরকার নেই। কারণ, আমি আর আমাদের এই সাহেব আমরা দু'জন বাইরে থেকেই ঠিক করে এসেছি যে, কোনো বাড়তি লোক আজকের বৈঠকে ঢুকতে দেব না। আমরা এই ক'জন মিলে যা ঠিক করব পরে সবাইকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিলেই চলবে।

রুহুল : বেশ, বেশ। উত্তম। আপনি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষি। আমরা রাজনীতি করি, ইমান, ঐক্য, শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পুঁজি নেই।

শরীফ : শান্তিতে যতদূর হয়। নিশ্চয়ই। সে-পথই ভালো। নইলে আচকান পায়জামা ছেঁড়া যাবে। হাড়গোড় ভাঙ্গা যাবে। তাতে লাভ কী ?

হক্ : শরীফ সাহেব কথাটা ঠিক বলেননি। এ-বকম চোখে দেখলে প্রতিষ্ঠানেব প্রাণশক্তি এবং চিন্তাশক্তির অপমান করা হবে। আপনি কি বলতে চান আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধুই ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করা নিয়েই মত ও পথের বিরোধিতা ? জীবনের আদর্শগত কোনো দার্শনিক তত্ত্বই কি এদের এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মূলে অনুপ্রেরণা জোগায় না।

সকলে : মারহাবা! মারহাবা!

সাহেব : আমি আমার আদর্শের কথা ভুলিনি। আদর্শের কথা ভুললে কওমী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকারও আর কোনো সার্থকতা থাকত না। তবে, আজ আপনাদের আমি একটু অনুরোধ করব।

হাওই : আলোচনার দ্বারা সুরাহা হয়ে যায় ভালোই। নইলে শরীফ সাহেবের ভাষায় অন্য পথ তো রয়েইছে!

সাহেব : ঠিক। কথাটা খুবই মামুলি, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানের এখন নবশক্তি সঞ্চারের সুযোগ হয়েছে। সময় হয়েছে এখন এব মধ্যে নয়া রক্ত সঞ্চালনের।

কোরেশী : কাজেই তোমার চোখে আর একবত্তি ঘুম নেই।

লম্বাকোর্তা : পাকিস্তানে আমরা এসব বরদাশত করব না। এ পাকিস্তান আমরা পাক সাফ রাখবই।

শরীফ : আলবত।

(সাহেব ও মুন্সী সাহেব এবং তাদের দুই অনুচব দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা।)

সাহেব : আমার কথাটা সম্পূর্ণ করতে দিন। আমি বলছিলাম, তেমনি জেগেছে আজ দেশের আওরত জাতি।

সকলে : মারহাবা! মারহাবা!

সাহেব : তাই বলছিলাম, পুরুষ শাখার যিনি সভাপতি হবেন, তাকে হতে হবে পুরুষ-সিংহ। কোনো বাহাত্তুরে বুড়োর কাজ নয়। প্রতিষ্ঠানের ও কওমের এই জাগ্রত নব শক্তিকে...।

(বাক্য শেষ হবার পূর্বেই মুন্সী ও তার অনুচর লাফিয়ে পড়বে সাহেব ও তার স্যাঙ্গাতের ওপর। অপটু ধস্তাধস্তি। চেয়ার ওল্টানো, আচকান-কোট টানাটানি। হ্যাট-টুপি ছেঁড়াছেঁড়ি। শরীফ এসে অম্লান বদনে কোরেশীর পক্ষ অবলম্বন করে। হক শান্তি স্থাপনের অভিনয় করবে। সাহেব ও তার চর কাবু হবে।)

কোরেশী : (হাফাতে হাঁফাতে) যতসব বদখাসলিয়ত!

সাহেব আমি আমার এই মুষ্ঠিবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে এই গৃহ ত্যাগ করছি। জবাব কাউন্সিল মিটিং-এ দেব। কিন্তু মনে রাখবেন মিসেস ফিকরী খানমকে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট আমি বানাব, বানাব, বানাব।

(অনুচরসহ বেগে নিষ্ক্রমণ।)

রুহুল : এ্যাঁ। হক এসব কথার অর্থ কী? এ ব্যাটার মতবাদে এ বিবর্তন কেমন করে সৃষ্টি হলো?

কোরেশী : মিসেস ফিকরী খানম! প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তাকে লাভ করা আমাদের এক মহা সৌভাগ্য!

রুহুল : মুন্সী সাহেব, আপনি এরপর আর কোনোদিন সকাল বেলা কিছু খাবেন না। এত অল্পে এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি।

কোরেশী : (এক গ্লাস পান করে) এইবার তুমি জবাব দাও। গতকাল পর্যন্ত সবাই ছিল মহিলা শাখার বিরোধী, আজকে দেখছি সবাই খানম-পাগল। বল, কী করেছ তুমি?

হক : আমি? আমি কিছু করিনি স্যার! আপনিই'ত চাইছিলেন ওনাকে সবাই মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট করুক। সবাই সমস্বরে এখন সে দাবি জানাচ্ছে। এতে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ আমি দেখি না।

(হঠাৎ ভেতরের দিকের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কে যেন দড়াম দড়াম করে আঘাত করে।)

রুহুল : এ-কী? ওখানে কে? দরজাটা তুমি আবার বন্ধ করলে কখন? হা করে চোখ বড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? দরজা খুলে দাও।

(স্তম্ভিত, হতভম্ব, শঙ্কিত হক এগিয়ে দরজা খুলে দিতেই এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা উড়িয়ে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপর্যস্ত বেশভূষার এক সুদর্শনা স্থির যৌবনা তরুণী।)

রুহুল : মিসেস ফিকরী খানম!!

খানম : (আর্তস্বরে) বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

রুহুল : কে? কারা? কী হয়েছে আপনার?

হক : হঠাৎ চেঁচামেচি করে ওপর থেকে বেরিয়ে এখানে আসা আপনার উচিত

হয়নি।

খানম : আপনি ভাবছেন সবটা আমার অভিনয় ? আমি মিছামিছি আপনাদের ভয় দেখাচ্ছি। সন্দেহ থাকে তো নিজে ঘরে ঢুকে একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিন।

রুহুল : কে ? কারা নিচে ? কী করছে তারা সেখানে ?

খানম : চোরা সিঁড়ির দরজায় তিনজন একসঙ্গে এসে হাজির। এখান থেকে বেরিয়েই বোধহয় তিনজনই সোজা ঐ দিকে রওনা হয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় খুনাখুনি হয়ে গেছে। আমার ভয় করছে।

হক্ : আপনি গিয়ে ও-দিক্‌কার ঘরে বসুন। কোনো ভয় সেই। আমি দেখছি সব।

খানম : (এগুতে এগুতে) এ-রকম জানলে ওদের কক্ষণো আমি এত শরাব খেতে দিতাম না। হাতে তুলে দিলাম যখন, তখন পানির মতো চুমুক দিয়ে খেল। এখন এ-কী কাণ্ড'

(বলতে বলতে প্রস্থান।)

(হক্ ঘুরে চোরা সিঁড়ির খোঁজ নিতে এগিয়ে যাবাব সময়-)

রুহুল : দাঁড়াও। আমার কয়েকটা সোজা প্রশ্নের জবাব দিয়ে নাও।

হক : বলুন।

রুহুল : মিসেস খানম সারাবাত আমার বাড়িতে, ঐ ঘরেই ছিলেন ?

হক্ : জি।

রুহুল : মুন্সী সাহেব, বেতাল সাহেব আর মাতাল সাহেব তিনজনই যখন এক এক করে ঐ পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়, তখন তারা যাবার পথে সবাই এক একবার করে মিসেস খানমের সাক্ষাত লাভ করেছে'

হক্ : জি।

রুহুল : এসব তুমি কার হুকুমে করেছ ?

হক্ : মিসেস ফিকরী খানমের। অবিকল আপনার সেই ফারসি বয়েতটার মতো। আমি আপনার গোলাম। বেগমের বাঁদী ইরানী বেটি। ফিকরী খানম আপনার কি জানি না, তবে বয়েতটা কি জানি। প্রভুকে কাবু করতে হলে গোলাম ধরো। বেগমের বেলায় বাঁদী। মিসেস ফিকরী খানম আমাকে ধরেছেন। আমি যাই। দেরি করলে পুলিশ ডাকতে হতে পারে।

(প্রস্থান)

রুহুল : কাউন্সিল মিটিং-এর আগেই এই! সামনে তক্‌দিরে কী লেখা আছে আল্লা মালুম'

(একটি সম্পূর্ণ বোতল উপুড় করে ঢক্‌ঢক করে একটানা চুমুকে শেষ করে। ঠক করে বোতলটা রাখে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে নিজেও মাটিতে বসে পড়ে।)

[যবনিকা]

গতকাল ঈদ ছিল

চরিত্র

মৌলভি মোখছেদ আলী	:	উচ্চপদস্থ সরকাবি কর্মচারী
নওয়াব মিয়া	:	দূব সম্পর্কেব কোনো ভাই-এর ছেলে
খোরশেদ আলী	:	বড় ছেলে। বিজ্ঞানের ছাত্র
খসরু	:	জায়গির থাকিয়া পড়ে
বেগম সাহেবা	:	আম্মাজান
সাহারা	:	বড় মেয়ে
আয়েষা	:	কলেজের ছাত্রী
আমিনা	:	দশম শ্রেণীর ছাত্রী

প্রথম দৃশ্য

মোখছেদ আলী সাহেবের বাড়ি, খসরুর ঘর।

আসবাব : পড়ার টেবিল। শুইবার চৌকি। দুই একটা চেয়ার।

দিন : ঈদের আগের দিন

ক্ষণ : আছরের নামাজের পর

[পর্দা উঠিলে দেখা যাইতেছে খসরু টেবিলেব উপর পা তুলিয়া একটা অতিকায় বই নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছে। হাতে কম্পাস এবং বিচিত্র নক্সায় পরিপূর্ণ কতগুলি কাগজ সামনে। ঠোঁটে সিগাবেট। পেছনের বন্ধ দরজা ঠেলিয়া চুপিচুপি... প্রবেশ করিল আমিনা। হাতে খাতা।]

আমিনা : (চৌকিতে বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে) মাস্টার সাহেব !

খসরু : বলুন।

আমিনা : মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে উত্তর দিলেও এমন কিছু ক্ষয়ে যাচ্ছে না !

খসরু : মুখ না ঘুরিয়ে যদি উত্তর দেয়া যায়, তাহলে কষ্ট কবে লাভ কী ? বলুন।

আমিনা : ট্রানসলেশন দেখে দিন।

খসরু : কী লিখেছেন পড়ে যান, এতে রিডিংটাও অভ্যেস হবে।

আমিনা : (দাঁত কিড়মিড় করে) মানুষের মধ্যে যারা জানোয়ার কেবল...

খসরু : Only those men who are animals—

আমিনা : কুত্তা !

খসরু : Dog না, বরঞ্চ লিখুন Cat

(আমিনা সজোরে খাতাটা খসরুর মস্তকে নিক্ষেপ করতঃ লাফাইয়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিল।)

খসরু : (বই নামাইয়া) মুরব্বির সঙ্গে এমনি করে ব্যবহার করতে হয় ? এটা কি কোনো ভদ্রমহিলাব মতো আচরণ হলো ?

আমিনা : খসরু ভাই।

খসরু : কী আনু ?

আমিনা : আমার নাম আনু নয়।

খসরু : তাহলে কি তোকে 'আমি' বলে ডাকব ?

আমিনা : আমার নাম আমি-ও নয়, আনুও নয়। আমার নাম আমিনা। আর আমার সঙ্গে সব সময় তুই তুকারি করে কথা বলবেন না।

খসরু : তাতো বলিই না। তোর আব্বা আম্মার সামনেও তোকে তুমি সম্মান

দিয়েই ডাকি।

আমিনা : আব্বা আম্মাকে মিষ্টি কথায় অত ভুলাতে পেরেছেন বলে তাদের অত বোকাও ভাববেন না। আর তাঁরা আপনাকে বড্ড বেশি আদর করেন বলে ভাববেন না যে তাব দাবিতে আপনি যা খুশি তা করতে পারেন।

খসরু : যেমন ?

আমিনা : তুমি—

খসরু : কী বললেন ?

আমিনা : ঠাট্টা বাখো খসরু ভাই। নামাজ পড়বার সময় তুমি অমন করে পেছন থেকে আমার মাথাব কাপড় ফেলে দিয়ে চলে এলে কেন ?

খসরু : এমনিই তো দেখতে যা চেহারা, তার ওপর আবার মাথায় কাপড় দেয়া হয়! খোদা দেখলে বলত কী ? হাঁ!

আমিনা : খসরু ভাই ! (ধমকে)

খসরু : কেন খামকা ঝগড়া করতে..... বল্‌তো ? তোর ভালোব জন্যে একটা কাজ করলাম— তুই-ই শেষে কোমর বেঁধে মারতে এলি আমায়!

(আমিনা স্থিব দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। খসরু সিগাবেটটাকে ভাল কবে চেপে ধরে ফুঁকে)

কিছু মনে করিস না আনু একটা কথা বলি তোকে। তোব ছলছুতোগুলো এত সরল যে অনেক দূর থেকেই ওর ফাঁকা ছেঁদাগুলো পরিষ্কাব দেখা যায়। গোধূলি লগনে আমার ঘবে ঢুকলি, ভাবটা এই যেন, কিছু নয় ট্রান্সলেশন করবি বলে এলি। অথচ ফুলো কণ্ঠনালিতে মুখরা কুঁদুলী মেয়ে নীল শিবায় বগবগ করছে। তারপব সত্যি সত্যি যখন ঝগড়া করতে নামলি তখন দেখি ভেতর থেকে অশান্ত, অবাধ্য দুষ্টুবোকা মন কেবল উঁকিঝুঁকি দেয়। এই চোখটা একটু নামা না, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবি নাকি ?

(আচমকা আমিনা টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়ে বড় বইটা খসরুব হাতে ঠুকে দিলো। তারপর ক্ষিপ্র হস্তে ওব মুখের সিগাবেটটা টান দিয়ে নিয়ে, সুড়ুৎ করে চৌকিটার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। হতভম্ব খসরুব অস্ফুট অবাকধ্বনি উচ্চারিত হবার আগেই—)

আম্মাজান : তোমায় কতবার বারণ করেছি, খসরু। অতো পড়ো না, পড়ো না, চোখ দুটো কি একেবারে খেয়ে ফেলতে চাও!

খসরু : পড়ছিলাম কোথায় খালাম্মা, আমি তো—

আম্মাজান : হ্যা হ্যাঁ কথা বলছিলে বলে মনে হলো যেন। কাব সঙ্গে কথা বলছিলে, এখানে ছিল নাকি কেউ ? কী বললে, আমি আসাব আগেই চলে গেছে ?

খসরু : চলে যাবে কে আবার ? ছিলই না কেউ এখানে। আমি তো আপন মনেই এমনি বকছিলাম

আম্মাজান : পাগল ছেলে আমার! (যেতে যেতে) আচ্ছা ইফতার করে ছাদে যাস, সবই মিলে চাঁদ দেখব। (প্রস্থান)

আমিনা : (বেরুতে বেরুতে) কী নোংরা তোমার চৌকির নিচটা! পোড়া সিগারেট দেশলাইর কাঠি যত রাজ্যের জঞ্জাল!

খসরু : ওটা আস্তাকুঁড় হলেই বা এমন কী এসে যায়। আমায় তো আর চৌকির নিচে শুতে হয় না। আমি সাধারণত ওপরেই ঘুমোই।

আমিনা : (আঙুল চুষতে চুষতে) স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ!

খসরু : আহা? বড়াই কত! পালালি তো নিজের ভয়ে, ভাবখানা এই যেন আমায় বাঁচাতে।

আমিনা : যা তা বলো না খসরু ভাই, ভয় কীসের?

খসরু : কী কচি খুকিরে! টেবিলের ওপর, আমার বুকের কাছে বসে, আবছা আলো, দরজা ভেজানো—ওকী আঙুল চুষছিস কেন, ইফ্‌তিরি হচ্ছে নাকি?

আমিনা : জ্বালা করছে যে!

খসরু : কী হলো, কিছুতে—

আমিনা : কিছুতে নয়, তাড়াতাড়ি করে তোমার সিগারেট নিভাতে যেয়েই তো পুড়ে গেল। চৌকির নিচ থেকে ধোঁয়া উঠলে তোমার রোজা রাখার মুখোশটা খুব আঁট থাকত না?

খসরু : রোজার তাঁনত তোর জন্যেই করি আমি। নইলে খালু খালাম্মা বিরূপ হবেন সে আশঙ্কা যে আমার চেয়ে আমার 'আমির'ই বেশি—

আমিনা : খসরু ভাই, জ্বলছে যে!

খসরু : জ্বলছে? দেখি, তাই তো (হাত নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে) আরে কী ভয়ঙ্কর লাল হয়ে উঠছে। ফোস্কা পড়বে নাকি?

আমিনা : যাও তোমার আর ফাজলেমির দরকার নেই, ছেড়ে দাও আমার হাত। অসভ্য, বেদরদি কোথাকার! ছেড়ে দাও বলছি—

খসরু : তাই তো কী করা যায় এখন। তুই তো আর রোজা, তোর তো চোষা ঠিক হবে না! আর তোর মুখে পোরা এঁটো হাত আমিই বা কী করে—

আমিনা : ভিক্ষে চাইছি, দেবে এবার ছেড়ে?

খসরু : এতো ভয়? দেখলই বা কেউ, কী হবে। হঠাৎ নওয়াব মিয়া এখন এঘরে এলেতো বেশ মজাই হয়।

আমিনা : না না খসরু ভাই সত্যি আমার ভয় করছে। নওয়াব মিয়া টের পেলে আব্বা আম্মাকে এমন করে লাগাবে যে তোমার আর এখানে এক মুহূর্তও টিকতে হবে না।

খসরু : এত প্রতাপ তার! গত চার বছরের খালু খালাম্মার সব অকৃত্রিম ভালবাসা উবে যাবে?

আমিনা : সব!

খসরু . তাও মন্দ নয়, একবার পরীক্ষা করতে দোষ কি ? (বার হতে একটা অস্পষ্ট শব্দ) ঐ যে নাম করতেই বোধ হয় এসে হাজির হলো।

আমিনা · খসরু ভাই মরবে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বলছি, ছেড়ে দাও— (খট খট)

খসরু · (সিঁড়ির ওপর থেকে কার নামার শব্দ) তোর আঙুলগুলো আরেকটু মুখের কাছে তুলি ?

আমিনা : (কান পেতে কী শোনে)

(ভ্রু দুটো একটু কুঁচকে) নাও আরো কাছে তুলে নাও।

খসরু : হঠাৎ এতো সাহস যে ?

আমিনা . আয়েষা আপা, আয়েষা আপা তোমার ঘরে আসছে।

খসরু : (চমকে— ভয়ার্ত— হাত ছেড়ে দেয়) আয়েষা'

আমিনা · হ্যাঁ আয়েষা আপা, তোমার ঘরে আয়েষা আপা এমন সময় কেন আসে ?

খসরু · আনু কী বকছিস ? তাড়াতাড়ি লুকো কোথাও, যা চোখ আবার আয়েষার—

আমিনা · না আমি লুকোব না। যা করছিলে আমার হাত ধরে তাই করো- আয়েষা আপা দেখুক—

খসরু : আনু'

আমিনা : দেখলে পরে তোমার ঘরে এমন সময় কোনোদিন—

খসরু : বড্ড ছেলেমানুষী হচ্ছে আনু' তোর নিজের জন্যে না হলেও, অন্তত আমার জন্য কর-উহ্-এঁসে পড়ল বলে বুঝি। তাড়াতাড়ি ঐ চৌকিটার নিচে। হয়েছে—বাস্। ফোঁস ফোঁস করিসনে যেন। নিঃশ্বেস বন্ধ করে থাকিস— যা কান আবার ওর!

(আমিনাকে চৌকির নিচে ঠেলে উপুড় হয়ে ওর শাড়ির প্রান্তদেশ গুঁজে শেষ করে দাঁড়াতে যাবে এমন সময়..)

আয়েষা : (ঘরে ঢুকে) ওকী উপুড় হয়ে কী করছিলেন মাস্টার সাহেব ? হাঁপাচ্ছেন কেন অত ?

খসরু : একটা ইঁদুর ভয়ঙ্কর জ্বালাচ্ছিল।

আয়েষা : ইঁদুর ?

খসরু : হ্যাঁ! আমি বসে বই পড়ছিলাম তা ব্যাটার একদম নজরেই এলো না। লাট সাহেবের মতো টেবিলের নিচে বিছানার ওপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। বেজায় বেয়াদপ ইঁদুর!

আয়েষা : আশ্চর্য তো !

খসরু : বলো না আর ! আজ ব্যাটাকে মেরেছিলাম আর কী । একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, চৌকির নিচে পালিয়ে গেল।

আয়েষা : বলেন কী ? এখনো আছে নাকি ?

খসরু : বোধ হয়।

আয়েষা : দাঁড়ান আমি তাহলে আমার বেড়ালটাকে ধরে নিয়ে আসি, কী বলেন ?

খসরু : সঙ্গে বাবুর্চিকেও বলে আসবেন একটা লাঠি নিয়ে আসতে, ব্যাটাকে আজ আমি খতম করবই!

আয়েষা : হ্যাঁ তাও মন্দ হবে না। আপনি দরজাটা ভাল করে এঁটে দিয়ে ওই নর্দমাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি এক্ষুণি আসছি। ওকী ? কী একটা শব্দ হলো যেন ?

(আয়েষা বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় আর খসরু সামনে)

খসরু : শব্দ ?

আয়েষা : হ্যাঁ চুষনির মতো।

খসরু : ইঁদুরের ডাক বোধহয়, ব্যাটা ভয় পেয়েছে তাহলে। আলোটা জ্বালিয়ে দেখব না কি ?

আয়েষা : (তাড়াতাড়ি হাত ধরে) না না আলো জ্বালাবেন না। হঠাৎ বেশি আলো দেখলে লাফালাফি করে পালিয়ে যেতে পারে। ওটা কী, ফোঁস করে কি একটা শব্দ হলো যেন ?

খসরু : ফোঁস করে? সাপ নাকি ?

আয়েষা : ওমা ! সাপ ! (ভয়ে জড়সড় হয়ে খসরুর বুক ঘেঁসে দাড়ায়। হঠাৎ হেসে ওঠে) কী ভীতু আপনি ! ফোঁস একটুখানি শব্দ শুনেই ভয়ে কাঁপছেন ? দেখব নাকি নিচু হয়ে ওটা কি সাপ না ব্যাঙ ?

খসরু : না, না, শেষে কী বিপদ হয়ে পড়বে কে জানে ?

আয়েষা : আপনার জন্যে একটুখানি বিপদে না হয় শখ করেই পড়লাম।

খসরু : তাছাড়া তোমার অমন দামি শাড়িটা আমার মেঝের ময়লা লেগে কলঙ্কিত হয়ে উঠবে যে !

আয়েষা : আপনার ঘরে আসবার সময় কলঙ্কের ভয় আমার থাকে না।

(বিড়বিড় করে বলতে বলতে গুঁজো হচ্ছিল)

খসরু : (বাধা দিয়ে হাত ধরে) কলঙ্কের ভয় তোমার না থাকলেও আমার আছে, কাজেই শাড়িটা নষ্ট করতে তোমায় আমি দেবো না।

আয়েষা : চুড়িগুলো ছেড়ে দিয়ে আরেকটু উপরে ধরুন।

সাহারা : (নেপথ্যে) খসরু ঘরে আছ ?

আয়েষা : আস্তে আপা। আস্তে চুপি চুপি কথা বলো!

সাহারা : (মুখে চমকে ওঠা ভাব, কণ্ঠস্বর সপ্রতিভ) চুপি চুপি কেন ? কী হয়েছে ? খসরু ঘরে নেই ? দরজাটা খোল না ?

আয়েষা : (খসরুর হাত ছাড়িয়ে দেয় অথবা খসরুই ছেড়ে নেয়) খুলছি। দরজাটা খুলুন না খসরু ভাই। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? খুব সাবধানে কিন্তু

পালিয়ে না যায় যেন ?

খসরু : (সামলে নিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সাবধানে ঢুকো আপা। অল্প একটু ফাঁক করছি আমি। পা'টা গলিয়ে দাও ওর মধ্যে।

আয়েষা : ঢুকে পড় না শুট করে, পালিয়ে যাবে যে!

সাহারা : (প্রথমে জামদানি শাড়িব একটুখানি প্রান্ত, পরে পা, তার পেছন সমস্ত শবীরে ঘরে প্রবেশ কবতে করতে— সন্ত্রস্ত) কী, কী পাগলামি ?

খসরু : ইঁদুর—

সাহাবা : ইঁদুর ? ওরে বাবা আমার পায়েব ওপর ওটা কী লাগল !

(এবং পর-মুহূর্তে একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে দু'লাফে সাহারা একেবারে খসরুব চৌকিব ওপর আসীন। দুর্বল চৌকি একটুখানি আর্তনাদ করে উঠল। দরজাটা হাঁ করে।)

খসরু : যাঃ ব্যাটা পালিয়ে গেল !

আয়েষা : আপনাব যত অনাচ্ছিষ্টি ভয় !

সাহাবা : খসরু এখনও চৌকিটা বদলে নাওনি ? যা নড়বড়ে, আমার কিন্তু সত্যি ভয় করছে। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে শেষে একটা কিছু হয়ে না যায়!

আয়েষা : চৌকির আর দোষ কী, দিন দিন যা বহবে বাড়ছ !

(এক হাতে একটা ছুরি, অন্য হাতে একটা ফরসেপ নিয়ে দৌড়ে ঘবে ঢুকে খোরশেদ)

খোবশেদ : কী কী হয়েছে অত গণ্ডগোল কীসেব ?

আয়েষা : তোমাব আব খবরদারি করে দরকাব নেই।

খোরশেদ : চুপ কর্ আয়েষা। হট্টগোল করে করে আমার সমস্ত একস্‌পেরিমেন্টটা নষ্ট করে দিলি। আর এই (আয়েষাকে) অত গয়না পরে থাকিস কেন ? কী বিকৃত রুচি মেয়েগুলোর— যেখানে সেখানে ছেঁদা করে সোনামুক্তা গেঁথে বাখে— কী অপব্যয়! (আয়েষা পরম তাচ্ছিল্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়) আব খসরু বুঝলে কী আশ্চর্য ! খোদা ওদের এত মাংস দিয়েছে অথচ এতটুকু প্রাণ দেয়নি, এতটুকুন বুদ্ধি দেয়নি ? আরে শরীরে ফাঁকা জায়গা তো একটাই আছে, বাইবেব জিনিস দিয়ে যেটা ভরাট করা যায়— সেটা হচ্ছে পেট। সেই হাজাব হাজার শূন্য গহ্বর অভুক্ত থেকে চারদিকে কাতরাচ্ছে। আর এরা কিনা, এখনও শরীরের নানা স্থানে বাঁকা করে, ভাঁজ করে, গর্ত করে তাবপর সেগুলো মণিমুক্তো দিয়ে ভরাট করছে। পিশাচ! পিশাচ!

খসরু : দাদা ওকথা থাক এখন।

খোরশেদ : আচ্ছা থাক থাক। সে কথা থাক। কিন্তু Sciatic nerve ছিঁড়ে গেল যে, আমি এখন আব একটা ব্যাণ্ড কোথায় পাই!

সাহাবা : তুমি আবার এখন ব্যাঙ খুঁজতে আরম্ভ করবে নাকি। ওসব হবে না দাদা, তার চেয়ে ছাদে চলো সবাই মিলে ঈদের চাঁদ..

খোরশেদ : ঈদ! হুম! ঈদ আতর আর খানা না! পিশাচ, পিশাচ। যাক ওসব কথা, থাক। খসরু তোমার ঘরে ব্যাঙ নেই?

খসরু : ব্যাঙ না'তো।

খোরশেদ : বড় মুশকিল হলো। আবার তাহলে একবার ফিরে জাদের বাড়িতে যেতে হবে দেখছি... সন্ধেও হয়ে এল। (ফিরে দাঁড়ায়)

সাহাবা : ব্যাঙ নেই কেন... দাদা আবার এখন বেরুবে। সারারাত হয়তো তাহলে আর ফিরবেই না। তোমার এখানে ইঁদুর আছে আর ব্যাঙ নেই। খুঁজে দেখ না একটু।

খোরশেদ : (ঘুরে দাঁড়ায়) ইঁদুর ছিল। তাহলে বোধহয় ব্যাঙও আছে। বুঝলে খসরু ইঁদুরের রোগ ধ্বংস করতে। তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ দু'দুটো লোক ১ নং বস্তিতে মারা গেল। ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে বোধ হয় এ বছরও আর বেশি দেরি নেই। ব্যাঙ-লালা দিয়ে একটা প্রতিকার—থাক থাক ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না। তোমার চৌকির নিচে-টিচে এক আধটা-

(নিচু হয়ে দেখতে যাবে—)

খসরু : (বাধা দিয়ে) থাক থাক আপনি কষ্ট করবেন না, আমিই দেখছি আপনি বসুন আপনি চৌকির ওপর বসুন— হ্যাঁ ঠিক হয়ে বসুন।

(জোর করে বসিয়ে দেয়, চৌকিটা কঁকিয়ে ওঠে)।

(খসরু উপুড় হয়ে খুঁজছে)

খোরশেদ : দেখছ এক আধটা?

খসরু : না, তো।

সাহারা : তুমি অন্ধকারে কী করে দেখবে?

খোরশেদ : তাই তো দাঁড়াও আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

(খসরু বাধা দেবার আগেই আলো জ্বলল)

দাঁড়াও আমিও একসাথে খুঁজছি।

খসরু : না না এই যে, আমি দেখছি কিছু।

(আড়চোখে সাহারাকে দেখে)

খোরশেদ : পেলে, পেয়েছ ব্যাঙ?

খসরু : হ্যাঁ, না, মানে ইয়ে ওটা খেয়ে ফেলেছে সব

সাহারা : ও, মাগো কীসে?

খোরশেদ : কে খেয়ে ফেলেছে

খসরু : [illegible], এখানে খাচ্ছে

সাহারা : [illegible]

খোরশেদ : দেখি তো।

(বলে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে)—

তাই তো ! এ দেখি একটা বস্তার মতো দেখাচ্ছে। দেব নাকি ছুরি দিয়ে একটা খোঁচা, আমার ব্যাঙ খেল।

সাহাবা : আ উ উ !

খসরু : না, না, দেবেন না, অমন কাজটি করবেন না যেন।

খোবশেদ : (আচমকা হো হো শব্দে হাসতে থাকে) হা-হা-হা— পেত্নীগুলোও দেখতে এতো বিচ্ছিরি— হা-হা-হা- (দরজা পথে পা বাড়ায়) হা হা হা—

সাহারা : দাদা দাদা আমায় একলা ফেলে যেও না বলছি— যেও না—

(এক লাফে, দুর্বল চৌকিটাকে একটা নির্মম আঘাত হেনে, খোরশেদের হাত ধরে জোরে বেরিয়ে যায়।—)

আমিনা : (গরগর) কুত্-তা (বেরুতে বেরুতে)

খসরু : ভালো হবে না বলছি, গাল দিলে ভালো হবে না বলছি আনু!

আমিনা : (সম্পূর্ণ বেরিয়ে) কুত্তা, কুত্তা, কুত্তা।

[যবনিকা]

ঢাক

চরিত্র

ফুফু আম্মা

বেজিনা

হাযদর সাহেব (চাচাজান)

প্রফেসর

খালেদ

আমিন

শব্দাবেষ্টনী : খুব করুণ এবং ক্ষীণ একটি সুরের রেশকে পেছনে রেখে মাঝরাতে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

কণ্ঠস্বর : আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ।

রেজিনা : কেন ? আল্লাহ্ এই শাস্তি কেন ? কোন অপরাধে ? খালেদ ভাই তো কোনো গুনাহ্ করেনি! আল্লাহ্ চাচাজানকে সুমতি দাও, সুমতি দাও! চাচাজান কেন সব জেনেশুনে ভেঙে চুরে খানখান করে দিতে চাইছেন ? কেন ? কেন ? কোন স্বার্থে ? আমাকে খালেদ ভাইর হাতে সঁপে দিতে চাচাজানের এত আপত্তি কীসের! আল্লাহ্ আমায় শক্তি দাও, শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, আলো দাও—

খালেদ : অন্ধকার ঘরে ডুকরে ডুকরে কাঁদলেই তো আর আলো জ্বলে উঠবে না রেজিনা!

রেজিনা : কে ? কে ? খালেদ ভাই! তুমি কখন এলে ? এ ঘরে ঢুকলে কখন ?

খালেদ : অ-নে-ক-খ-ন! সে-ই যখন থেকে তোমার একটার পর একটা 'কেন' অন্ধকারে অনর্থক ফোঁস ফোঁস করে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল— সেই তখন থেকে।

রেজিনা : আমি চলে আসার পর চাচা তোমাকে আর কিছু বলেননি ?

খালেদ : আমাদের মানে তোমাদের— খান্দানের পবিত্রতা, তার মর্যাদা, তার অতীত গৌরব এ স-ব তিনি আমায় নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিন তিনবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন— তোমাকে বিয়ে করার আজগুবে কল্পনা আমি যেন আমার মন থেকে মুছে ফেলি— চিরদিনের জন্যে!

রেজিনা : তুমি কী জবাব দিলে ?

খালেদ : তোমার চাচাজানকে বললাম আমি বাঁদির সন্তান, কিন্তু আপনার মরহুম বড় ভাই, এ খান্দানের অতীত মুকুট, এ জমিদারির প্রধান মালিক— তিনিই ছিলেন আমার জন্মদাতা।

রেজিনা : এসব কথা আমি শুনতে চাই না।

খালেদ : কোনো দিন শুনতে চাওনি বলেই আজ অন্ধকারে কেঁদে মরছো। চাচাকে বললাম আমার জন্মের সময়েই আমার মা'র মৃত্যু হয় শুনেছি। আপনার বড় ভাইও তার কিছুকাল পর ইন্তেকাল করেন। শুনেছি মরবার সময়েও তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। আমার দাইমার মুখে শুনতাম আমার মা পড়ালেখা জানতেন, নম্রস্বভাবা মেয়ে ছিলেন— শুধু বাবাকে যখন ভালবাসেন তখনই একবার জ্বলে উঠেছিলেন লকলক করে— বাবাও নাকি কোনোদিন মাকে অশ্রদ্ধা করেনি। এ বাড়ির অন্য কাউকেও করতে দেয়নি।

রেজিনা : যে বিরাট সম্পত্তি আজ চাচা দখল করে আছেন সামান্য একটু সামাজিক আইনের পরিবর্তে আজ তার একচ্ছত্র মালিক হতে পারতে তুমি! কোন অধিকারে চাচা আজ তোমায় কাঙ্গাল করে রাখতে চায়? কোন নীতিতে চাচা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়? জবাব দাও, খালেদ জবাব দাও, আমাকে!

খালেদ : [চাপা বিকৃত হাসি] তোমার চাচা কত উদার! পঁচিশ বছর ধরে আমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলেছেন! আমার পেছনে কত টাকা ঢেলেছেন! কী অধিকার ছিল আমার! তবু আমার খাঁই মিটল না!

রেজিনা : [ফোঁপানি] খালেদ!

খালেদ : আগামীকাল আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। তবে যাবার আগে আমাকে পঁচিশ বছর ধরে এই অভিশপ্ত বাড়িতে রেখেছেন বলে একটা ধন্যবাদও জানিয়ে দিয়ে যাব। আর—

রেজিনা : আর আ-মি?

[কে একটা লোক শিস দিতে দিতে আসছে।]

খালেদ : কে যেন এই ঘরের দিকেই আসছে।

[শিসটা নিকটবর্তী হবে এবং একটা দরজার সাথে ধাক্কা লেগে থেমে যাবে।]

আমিন : বাড়ি নয়তো একটা দুর্গ যেন! বারান্দাগুলো সুড়ঙ্গের মতো! আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু। তকলিফ করবে তবু একটু মেরামত হবে না! উহ! যা একটা ধাক্কা খেলাম দরজাটার সঙ্গে, কলার বোনটা ভেঙেই গেছে বোধহয়। দরজাগুলোরও যা ছিরি! সব পার্বত্যগুহা, গুহা! একেকটা দরজা আকাশের সমান উঁচু হাওদ্য চাপান হাতির সড়ক যেন! দরজা কী! ধাক্কালে নড়ে না, নড়ে উঠলে বাজ পড়তে থাকে!

খালেদ : সাবধানে ঘরে ঢুকো আমিন! দাঁড়াও আমি আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।

আমিন : আরে খালেদ ভাই যে! এ-কী রেজিনা আপাও দেখছি। তা অন্ধকারে ওরকম মমির মতো থম ধরে বসে রয়েছ কেন? তোমাদেরও যা কাণ্ড, এখনো কাচের ঝালরে মোম না গলালে তোমাদের চলে না। বাতাসও আর সব সময়ে মেজাজ বুঝে চলে না, যে অতবড় হা করা খোলা দরজা পেয়েও হু-হু করে ছুটে এসে ঝাপটা দিয়ে আলো নিভিয়ে দেবে না?

রেজিনা : হঠাৎ এখন কোত্থেকে এলে?

আমিন : অফিস থেকে।

রেজিনা : অফিস! এই গ্রামে? ছুটির পর কলেজে ফিরবে না নাকি আর? মতলব কী? অফিস কীসের?

আমিন : যাত্রাদলের। ওরা আমায় চাকরি দিয়েছে রেজিনা আপা।

খালেদ : তোমার আব্বা সেদিন চাচাজানের কাছে নালিশ করছিলেন— তুমি নাকি শহরে থেকে একদম বখে গেছ। কলেজ ফাঁকি দিয়ে কেবল গানবাজনা করে বেড়াও! গ্রামে এসে এখন যাত্রাদলের পালা শুরু করবে নাকি ?

আমিন : বাব্বা! অভিনয়! এ কম্মটি আমায় দিয়ে কোনো দিন হবে না। এই হপ্তা থেকে আমি ওদের একজন আবহসঙ্গীত পরিচালক— চারকোণা দুটো চৌকির ওপর রণক্ষেত্রের আবেষ্টনী তো শুধু চিৎকারেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে না ?

রেজিনা : কোন যন্ত্র তুমি বাজাবে ঠিক করেছ ? তোমার সেতার কি গীটার কিম্বা বেহালা ঐ যাত্রাদলের গগনভেদী হুঙ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে তো ?

আমিন : ম্যানেজারকে এইমাত্র বাজিয়ে শুনিয়ে এলাম। ব্যাটা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তোমরা সব শুনতে যেও কিন্তু! আমি ঢাক বাজাব!

রেজিনা : ঢাক ?

খালেদ : বাঁয়া নয়, তবলা নয়, খোল নয়, ঢোল নয়— একেবারে ঢাক-ই বাজাবে তুমি!

আমিন : তোমরা হাসছ, না ? বিশ্বেসই হচ্ছে না যে ঢাকের বাদ্যেও সাধনার প্রয়োজন হয়। বাজাতে জানলে ঢাকেও কালোয়াতি করা যায়। খুব হাসছ না, ভাবছ আমি মশ্‌করা করছি! হাতের কাছে একটা থাকলে দুটো কাঠি মেরে এখনি বুঝিয়ে দিতাম, আমার হাতের গুণ আর ঢাকের মাহাত্ম্য !

খালেদ : ঐ তো তোমার মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে একটা ঝুলছে— একবার দেখবে পরখ করে ?

আমিন : আরে! ওটা কোনোদিন আমার নজরেই পড়েনি। এ যে একেবারে বনেদি ঢাক, বেশ মোটাসোটা জবড়জং চেহারা দেখছি! অতবড় ধনুরে যন্ত্রে সুর তুলতে অসুরের শক্তি দরকার হতো নিশ্চয়ই। খালেদ ভাই তুমি একটু হাত দাও তো ওটাকে দেয়াল থেকে নামিয়ে নি আগে!

রেজিনা : আহাহা কী করছ তোমরা! ও ঢাকটা থাকুক না ওখানে। ওসব উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুরনো পারিবারিক সম্পদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। কখন কোনটা ছুঁলে কী হয়ে যায় কে জানে— চাচাজান শেষে মিছেমিছি একটা রাগারাগি করে বসবেন! ও ঢাকটা ছেড়ে দাও আমিন!

আমিন : অসম্ভব! এতবড় ঢাক আমি কোনোদিন বাজাইনি। কী ভারী খোল আর কড়া পর্দা! আমি হলপ করে বলতে পারি রেজিনা আপা, এই ঢাকের বোলে দরিয়াপুরের এই তিন মহলা জমিদারি কুঠি কড়িবরগা সুদ্ধ ছন্দে ছন্দে নাচতে শুরু করে দেবে।— এই— হ্যাঁ— এই— একটু, নিচে ধরুন খালেদ ভাই-এই-এই-এই ব্যাস-রাখুন, রাখুন মেঝের উপর এবার। ইস্ কতদিনের ঢাক এটা রেজিনা বু ? আংটিগুলোতে সুদ্ধ মর্চে ধরে গেছে।

খালেদ : এখানে বসেই বাজাতে শুরু করবে নাকি ?

আমিন : নিশ্চয়ই! এত কষ্ট করে ওটাকে নামালাম আর দুটো ঘা না মেরেই ওটাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন ? ঢাকের শব্দকম্পন থমথমে অন্ধকারে গুমগুম করে জমবে বেশি। এক ফুঁয়ে আলোটা নিভিয়ে ফেলুন তো খালেদ ভাই!

খালেদ : এই নাও, দিলাম।

রেজিনা : আমার কী রকম ভয় করছে! তুমি আমাব হাত ধবে থাক শক্ত করে।

সঙ্গীত ঝংকার তো থাকবেই | [ঢাক্ বাজবে। দুটো ভয়ঙ্কর গম্ভীব গুমগুম ধ্বনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু দূর থেকে একটা তীব্র, ভয়ার্ত কণ্ঠেব আর্তনাদ। সেই "Shreik" "কে—কোন্‌দিক থেকে" এ বকম প্রশ্ন দিয়েও শুরু হতে পাবে।]

[কয়েক মুহূর্তের আকস্মিক স্তব্ধতা।]

আমিন : কে ? চিৎকার করে উঠল কে ?

খালেদ : দরজার ওপাশে কে যেন হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল মনে হলো।

রেজিনা : আলো, শিগগিরি আলোটা জ্বালো! ফুফু আম্মার চিৎকার ওটা, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চই। আমার ভয় করছে।

আমিন : আলোটা আমার হাতে দিন, আমি বাব হয়ে দেখছি কী হলো। আপনাবা ভেতরেই থাকুন।

[একটু দূরে গিয়ে]

এ-কী ? রেজিনা আপা, তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি নিয়ে আসুন। দরজার কাছে আপনার ফুপু আম্মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে কী রকম ফেনা বার হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করুন।

[ক্ষণিক বিরতিসূচক সঙ্গীত-চিহ্ন। মৃদু, পরিচ্ছন্ন এবং সংযত গুঞ্জন, অস্ফুট উক্তি ইত্যাদি। রেজিনা, আমিন ও খালেদের মধ্যে— 'মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন খালেদ ভাই', 'মুখে আবো একটু পানির ছিটে দেব ?', 'এই তো চোখ মেলেছেন, জ্ঞান ফিরে আসছে'— ইত্যাদি]

ফুফু : আ-মি কো-থা-য় ? তোমরা আমায় নিয়ে এ ঘরে, কী করছ ? আমার কী হয়েছে ?

আমিন : এ ঘরের দরজার কাছে আপনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, আমরা—

ফুফু : ওহ্ ওহ্! হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঢাক! ঐ তো ! কে ? কে? কে ঐ ঢাক নামিয়েছে ? তোমরা কেউ উত্তর দিচ্ছ না কেন ? ওই ঢাক নামিয়েছে কে ? ও ঢাক বাজাল কে ? বল, বল, বল।

রেজিনা : আপনার শরীর এখনও দুর্বল, আপনি অত উত্তেজিত হবেন না ফুফু আম্মা।

ফুফু : থাক্ থাক্। আমায় আর ধরে তুলতে হবে না। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

ফুফু : ঐ ঢাক স্পর্শ করার মতো সাহস তোমরা কোত্থেকে পেলে ? ঐ ঢাকের চামড়ার লালচে পর্দাটা কীসের তৈরি জান ?

আমিন : আপনার কথা শুনে কেবল অবাকই হচ্ছি, বুঝতে পারছি না কিছু। আপনি হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন কেন ?

ফুফু : ঐ ঢাকের শব্দ শুনে; মানুষের চামড়ায় তৈরি ঐ ঢাক।

খালেদ : কী বলছেন আপনি ?

আমিন : রেজিনা আপা, এক বাটি গরম দুধ নিয়ে আসুন, জলদি করে। ওনার চোখ এখনো কী রকম ঘোলাটে দেখেছেন, কথাবার্তা খুব গোছালো মনে হচ্ছে না।

ফুফু : ছেলেমানুষি করো না। আমি এখন আব অজ্ঞান নই। যা বলছি, জেনে শুনে ভালো করে ভেবেই বলছি। তোমরা আজকালকার ছেলে, লেখাপড়া শিখে অনেক কিছুকেই অস্বীকার করতে শিখেছ। কথায় কথায় তোমাদের বিজ্ঞানের বাহাদুরি। কিন্তু ঐ ঢাকটা মানুষের গায়ের চামড়ায় তৈরি, এটা সত্য কথা। এ পরিবারের ইতিহাস যাবা একটু জানে, তারা কেউ ঐ ঢাক তৈবিব কাহিনীকে অবিশ্বাস করেনি।

আমিন : কাহিনী ?

রেজিনা : ঐ ঢাকটা মানুষের চামড়ায় তৈরি ?

খালেদ : আগে তো কোনোদিন শুনিনি।

ফুফু : এই পবিবারের কেউ ও কাহিনী নিয়ে কোনোদিন আলোচনা করে না। সবাই জানে, মাঝে মাঝে ভাবে, আব শিউরে ওঠে।

আমিন : শিউরে ওঠে ? কেন ?

ফুফু : আমার বাবা—

রেজিনা : লাল কাজী!

ফুফু : হ্যাঁ লাল কাজী বলেই দু'দশ গ্রামের লোক তাকে জানত। একরাশ সাদা দাড়ির ভেতর থেকেও রক্তবর্ণ গায়ের রং ঝকমক করত। বর্শা, লাঠি, তলোয়ার সবগুলো সমান চালাতে জানতেন। জমিদার লাল কাজীর নামে থবথর কাঁপত না এমন বুকের পাটা এ তল্লাটে সে জামানায় কারো ছিল না।

আমিন : তারপর!

ফুফু : একবার শুধু পাশের গ্রামের এক উদ্ধত জমিদার সীমানা নিয়ে লাল কাজীর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু করেছিল। সীমানা নিয়ে সে যুগের জমিদারে জমিদারে লড়াই— সে যে কী ভয়াঁনক রক্তারক্তি কাণ্ড তা তোমরা ভাবতে পারবে না। লাঠি, সড়কি, বর্শা সব দু'দলই এনে জড়ো করল সীমানাব এক প্রান্ত থেকে শুরু করে অন্য কিনার অবধি।

আমিন : রীতিমতো যুদ্ধ বলুন।

ফুফু : লাল কাজীর সীমানা প্রহরীদের মধ্যে একটা ছিল বছর দশেকেব রোগা লিকলিকে ছেলে। উঁচু গাছের মাথায় মাচা করে বসে ও পাহারা দিত। একদিন শেষ রাতের দিকে বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঝিমুতে থাকে, ঘুমের ভারে চোখ মেলে রাখতে পারছিল না— ঠিক সেই মুহূর্তে ও দলের এক দংগল লেঠেল সীমানা পেরিযে লাল কাজীর জমির ফসল কেটে নিয়ে সরে পড়ে।

রেজিনা : ফুফুআম্মা!

খালেদ : ঐ ঢাক কার চামড়ায তৈরি ফুফু আম্মা ?

আমিন : কাহিনী বলতে জানেন বটে। গোটা ব্যাপারটাকে রীতিমতো বহস্যময়-বোমাঞ্চকর করে তুলেছেন।

ফুফু : পরেরদিন ভোরে ছেলেটাব শাস্তি হলো। কাঁটা বসানো চামড়াব চাবুকে ওর পিঠ কেটে ছিলে রক্তে একাকাব। আশির ঘরে পৌছবাব আগেই গোঁ গোঁ করে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে আর নড়ল না। মরে শক্ত হয়ে পড়ে বইল। গুণে গুণে চাবুক একশ অবধি চলল। তারপর ওর চামড়াটা খলিয়ে শুকিযে একটা ঢাক তৈরি হয়। যাতে ওটা বাজাতে আর কোনো প্রহবী যেন কোনোদিন ভুলে না যায়। পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমিযে না পড়ে।

আমিন : Horrible!

ফুফু : আজ চল্লিশ বছর ধরে ও ঢাকে কেউ হাত দেয়নি। কিন্তু ঐ ঢাক এই চল্লিশ বছরের মধ্যেও একবারও তার কর্তব্য ভুলে যায়নি। প্রভুভক্ত পাকা শিকাবি কুকুবের মতো একটানা পাহারা দিয়ে এসেছে চল্লিশ বছব ধবে। যখনই সময় ঘনিযে এসেছে তখনই ডুগডুগ কবে বেজে উঠেছে, সংকেতে হুঁশিয়ার হতে বলেছে সবাইকে। তাই তো আজ আমি হঠাৎ ঐ ঢাকেব শব্দ শুনে অত চমকে উঠেছিলাম, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! আচ্ছা আমি যাই, শুতে যাই।

বেজিনা : আপনি একলা উঠবেন না। আমি ধরছি, আমার কাঁধে ভর করুন।

আমিন : এ ঢাক আপনা থেকেই বেজে ওঠে ? কাব জন্যে পাহারা দেয় ? সংকেত কীসের ? হুঁশিয়ার করে দেয় কাকে, কেন ? আমি কিছু বুঝলাম না!

ফুফু : মাঝে মাঝে এ ঢাক এমনি ডুগডুগ করে ওঠে। যখনই এ ঢাক বেজে উঠেছে সেদিনই এই পরিবারের প্রধান কর্তার মৃত্যু ঘটেছে। এ ঢাক এই বিরাট জমিদারির যে কোনো জীবিত প্রধান মালিকের স্থায়ী প্রহরী— তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবার আগে ঠিক ঢাক বাজিয়ে যাবে।

খালেদ : লাল কাজীর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে।

ফুফু : লাল কাজী, আমার বাবা, যেদিন মারা যান সেদিন সকালে সবাই ঢাকের বাদ্য শুনেছে। যেদিন সন্ধ্যায় তোমার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম হঠাৎ আসে সে দিন সকালে হায়দর আমি সবাই স্পষ্ট ঢাক শুনেছি। মনে হয় যেন কে ঢাকটাকে নিখুঁত তালে বাজাচ্ছে। একটানা ডুগ ডুগ শব্দ তুলে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে ক্রমশ এগুতে থাকে— তারপর আস্তে আস্তে

তালে তালে পা ফেলে দূরে মিলিয়ে যায়। এ রকম একবাব দু'বার তিনবার। একবার কাছে আসে আবার দূরে চলে যায়।

রেজিনা : এ ঘরে আরেকটু বসে বিশ্রাম নিলে ভালো করতেন ফুফু আম্মা। আপনি হাঁপাচ্ছেন এখনো।

ফুফু : ও কিছু না। থাক্ থাক্ তোমাকে ধবতে হবে না বাছা। আমি একলাই যেতে পারব। ঐ ঢাকটা তোমরা ধরাধরি করে এখনই তুলে রাখ। আমি যাই, শুয়ে পড়ি গিয়ে। ও কিছু না, ঢাকটা এমনি বাজেনি তো, আমিন না জেনেশুনে বাজিয়েছে। ও ঠিক আছে। আমি যাই।

[প্রস্থান]

খালেদ : আমিও যাই। চাচার সঙ্গে আর একবার মোলাকাত করে আসি।

রেজিনা : আজ রাতে একবার দেখা না করলেই নয়? একদিনের জন্য অনেক তো হয়েছে। মনের ওপর অত চাপ তোমার শরীরের জন্যে এমনিতেও ভাল নয়। নিজের ঘরে গিয়ে আজ রাতের মতো বিশ্রাম নাও। ঘুমুতে চেষ্টা কর।

খালেদ : ঘুম আসবে না। বুকের ব্যথাটাও যেন সময় বুঝে বেঁকে বসতে চাইছে। একদম কাবু কবে ফেলবার আগেই চাচার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভালো না?

রেজিনা : ও সব কথা মুখে এনো না।

খালেদ : আমি আমার ঘরে চললাম। দু'গ্লাস ওষুধ গিলে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নেব আগে। তারপর চাচার সঙ্গে আলাপ করব। চললাম আমিন। তোমার সঙ্গে বাকি কথাগুলো কাল ভোরে হবে রেজিনা— এখন যাই।

[স্তব্ধতা : বিদঘুটে : ক্ষণিকের]

আমিন : যতসব আজগুবে আষাঢ়ে গল্প! ওর আমি এক বর্ণও মানি না, বিশ্বাস করি না।

রেজিনা : আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। ওই ঢাকটা তুমি তুলে রাখ শিগগির।

আমিন : বললেই হলো না! বুড়ি বেহুঁশ হয়ে কী সব বকে গেল আর ওমনি তোমাদের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। এ ঢাক আমি বাজাব, তবে ছাড়ব।

বেজিনা : আমিন! অমন কাজ করো না! ফুফু আম্মাকে তুমি চেন না। এ বাড়িতে তুমি ও ঢাক বাজাতে পারবে না।

আমিন : তোমার ফুফু আম্মাকে চিনি আর না চিনি— শব্দ যন্ত্রকে আমি চিনি। আমি সুরের, শব্দের, রবের, ছন্দের সাধক। এ ঢাক আমার পছন্দ হয়েছে, এ ঢাক আমি বাজাবোই। কোনো রকম বুজরুকি নিষেধ আমায় বাঁধা দিতে পারবে না রেজিনা আপা!

রেজিনা : ও কী হচ্ছে আমিন?

আমিন : এই আমি ঢাক কাঁধে তুললাম। তোমাদের বাড়িতে না হয়, আমাদের বাড়িতে গিয়ে সাধনা করব।

রেজিনা : আমিন!

আমিন : (দূর থেকে যেতে যেতে) আমি চললাম রেজিনা আপা। আব্বা বোধ হয় এখন তোমার চাচাজানের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। আমাকে খোঁজ করলে বলে দিও বাড়ি চলে গেছি, উনি যেন অপেক্ষা না করে একলাই চলে আসেন।

[প্রস্থান]

[একটা দ্রুত শব্দতরঙ্গ ঢেউ তুলে এসে মিলে যাবে একজন ভারী গলার বৃদ্ধ অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠের অট্টহাসির সাথে]

প্রফেসর : (অট্টহাসি) তুমি অবাক করলে হায়দার, অবাক করলে। আজ বাদে কাল তোমার নিজের ছেলে বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে আসছে। তোমার মনে কিনা এখন ঐ কথা!

চাচা : (বিরক্ত ও ঈষৎ কড়া মেজাজে) উড়িয়ে দিতে চাইলে কী হবে? ঐ ঢাকের বাদ্য আমি নিজ কানে তিনবার শুনেছি। প্রথমবার আমার নিজের বাবা, তারপর আমার বড় ভাই, তারপবের বার ঐ রেজিনাব বাবাকে— আমার ছোট ভাইকে আমি আমার চোখের সামনে ছটফট করে মরে যেতে দেখেছি।

প্রফেসর : সে-তো অনেক কারণেই মবে যেতে পারে। ঢাক পিটুনি শুনে মরে গেল এ কথা তোমাকে বলল কে? মৃত্যুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কটাকে সরাসরি অস্বীকার করে একটা অশরীরি ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারলে তোমরা যেন আর অন্য কিছুই ভাবতেই চাও না।

চাচা : অস্বীকার আমি কিছুই করিনি।

প্রফেসর : কত বছর ধরে মরণের দূত সেজে, এ জমিদারীর প্রতি জীবিত মালিককে গুমগুম শব্দ তুলে সতর্ক করে দিয়ে যায়! পরপারের পাহারাদার যেন!

চাচা : তুমি বিজ্ঞানের প্রফেসর, পণ্ডিত লোক, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না।

প্রফেসর : বেশ!

চাচা : সমস্ত ছুটি এই গ্রামেই কাটাবে ঠিক করেছ?

প্রফেসর : হ্যাঁ। ও হায়দর, তোমার ছেলে বিলেত থেকে ফিরছে কবে? কোনো খবর-টবর পেয়েছ নাকি?

চাচা : এ মাসেই এসে পড়বে। ওদের আখ্‌তটাও আমি ঠিক করেছি যত তাড়াতাড়ি পারি সেরে ফেলব।

প্রফেসর : এত বেশি তাড়াহুড়ো না করে, আমার মনে হয় এ বিষয় নিয়ে রেজিনার সঙ্গে একটু আগে থেকে আলাপ করে রাখলে ভালো হতো না? রেজিনার নিজেরও বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার নিজস্ব একটা আলাদা মতামতও থাকতে পারে।

চাচা : না। নেই। থাকতে পারে না।

প্রফেসর : তাছাড়া তোমার ছেলেই যে বিলেত থেকে ঘুরে এসে রেজিনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে তারও তো কোনো ঠিক নেই।

চাচা : আছে। ঠিক আছে। আমার ছেলে আমার বুদ্ধি বিবেচনাকে শ্রদ্ধা করে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী ও চলবেই। যতদিন কাণ্ডজ্ঞান ঠিক থাকবে ততদিন আমার কথা মতোই ও চলবে। বিলেত থেকে আসছে বলেই ও আর অন্ধ হয়ে আসছে না।

প্রফেসর : এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। তোমার মতো সজাগ সংসারী বুদ্ধি ওর ঘটে যদি একটুও থাকে তবে রেজিনাকে বিয়ে করতে ওর এক রত্তিও আপত্তি হবে না।

চাচা : হতে আমি দেব না।

প্রফেসর : তাহলে তো হায়দর তুমি দেখছি বিরাট লোক বনে যাবে। তোমার বড়ভাইর মৃত্যুর পরবর্তী সর্বজ্যেষ্ঠ জীবিত মালিক হিসেবে বড়ভাইর অংশ তুমি পেয়েছ। এখন রেজিনা যদি তোমার ছেলেকে বিয়ে করে তবে ছোটভাইর অংশও তোমার দখলে আসছে বলো!

চাচা : হুম। খালেদ হচ্ছে আমাদের খান্দানের একটা ব্যাধিগ্রস্থ অঙ্গ, আমার মরহুম বড়ভাইর উচ্ছৃংখলতার স্মারক, আমার প্রতি পদক্ষেপের স্থায়ী শৃঙ্খল।

প্রফেসর : খালেদের বাবা দুশ্চরিত্র ছিল, এ কথা কোনোদিন বিশ্বেস করব না। ও তো খালেদের মাকে বিয়ে করার জন্য তৈরি হয়েই তোমাদের কাছে অনুমতি চাইছিল। বাঁদির সাথে বিয়ে দিতে অরাজি হওয়ায় সে গৃহত্যাগী হয়।

চাচা : ধর্মের, সমাজের অভিশাপ মাথায় নিয়ে এই বাড়িতেই নিজের মাকে খেয়ে খালেদ জন্মগ্রহণ করে।

[হঠাৎ গাঢ় কণ্ঠে]

খালেদ : কিন্তু আমি তবু চিৎকার করে ঘোষণা করছি আমি নিরাপরাধ, নির্দোষী, নিষ্কলঙ্ক। আমাকে সাজা দেয়ার আপনার কোনো অধিকার নেই। আজকে আমি এসেছি, আমার হক দাবি করতে— কীসের জোরে আপনি তা অস্বীকার করেন— আমি তা দেখব।

চাচা : খালেদ, তুমি আবার মদ খেয়েছ। তুমি এখন অপ্রকৃতিস্থ। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

খালেদ : আর সেই ফাঁকে বিলেত থেকে আপনার মূর্খ দুশ্চরিত্র সন্তান জাফর এসে রেজিনাকে বিয়ে করে সরে পড়ুক, না? চাচাজান, আমার হক আমি আজ আদায় করে তবে এ ঘর ছাড়ব।

প্রফেসর : তোমরা অত উত্তেজিত হয়ে উঠো না।

চাচা : তোমার কোনো হক নেই, ছিল না। পঁচিশ বছরের ওপর তোমায়

লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, অন্নবস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি— এইজন্য. খোদার কাছে শোকর গোজারী কর।

খালেদ : কিন্তু কেন ? কেন ? আমি তার জবাব চাই। রেজিনাব সম্পত্তিকে গ্রাস করতে চান বলে একটা লম্পটের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাইছেন— সেটা বুঝি।

চাচা : খালেদ!

খালেদ : কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে আমার অন্নবস্ত্র যুগিয়ে এলেন আপনি কোন স্বার্থে ? আপনার মধ্যে এতো উদাবতা রহস্যময়। জবাব দিন, বলুন কেন আপনি আমায় পঁচিশ বছর ধরে এতো সযত্নে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন ? জবাব দিন!

[ক্ষণিক স্তব্ধতা]

[দূরে খুব স্পষ্ট নয়, ঢাকের প্রাথমিক ভয়াবহ ধ্বনি]

চাচা : প্রফেসর! ঐ ঐ! শুনতে পাচ্ছ তুমি ?

[ঢাক থেমে গেছে]

প্রফেসব : ও কী, তুমি ও রকম করছো কেন ? কী হয়েছে ? কি ? কৈ আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

চাচা : শুনতে পাচ্ছ না। ঐ বারান্দার ঐ প্রান্ত থেকে উঠছে। ঢা-ক!

খালেদ : (অট্টহাসি) হা হা হা। আমার জবাব আমি পেয়েছি। পঁচিশ বছর ধরে চাচাজান ঐ ঢাক শোনাব জন্য অপেক্ষা করছিলেন ?

চাচা : প্রফেসর! আমি— আমি— আজই আমার শেষ দিন। প্রফেসর— আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি। গুনাহ, গুনাহ্!

প্রফেসর : শান্ত হও, শান্ত হও! ভুলও তো শুনতে পারো তুমি। শান্ত হও।

খালেদ : (অট্টহাসি) আপনিও শেষে গুনাহ্গার বলে স্বীকার যাচ্ছেন ? হা হা হা! আপনার নীতিবোধের এই নবজন্মকে মোবাবকবাদ জানাচ্ছি, চাচাজান। হা হা হা!

প্রফেসর : মাতলামি করো না খালেদ! তুমি শান্ত হও হায়দার!

চাচা : খালেদ! আমার সবচেয়ে বড় গুনাহ্ তোমার বিরুদ্ধে আমার হীন ষড়যন্ত্র! তোমার ভালোবাসার সামগ্রী থেকে, তোমার ন্যায্য সম্পত্তির অংশ থেকে তোমাকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করার জন্য আমি পঁচিশ বছর ধরে ষড়যন্ত্র করছি খালেদ।

খালেদ : তার অর্থ ?

প্রফেসর : তুমি কী বলছ হায়দার ?

[ঢাকের নিকটবর্তী নাদ]

চাচা : প্রফেসব! প্রফেসর! আমার কী রকম জানি দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

[ঢাক থেমে যাবে]

আচ্ছা প্রফেসর মরবার আগে সব গুনাহ্ স্বীকার করে, তওবা চাইলে— সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় না প্রফেসর ? বল হয়, বল।

প্রফেসর : হ্যাঁ, সব হয়! তুমি শান্ত হও।

চাচা : শোন খালেদ তোমার মা'র সঙ্গে তোমার বাবার ধর্মসঙ্গত বিয়ে হয়েছিল, তার আইনসঙ্গত দলিলপত্রাদি তোমার বাবা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যায়, যাতে—

খালেদ : বাবা!

চাচা . আমায় বাধা দিও না। সবটা বলে শেষ করতে দাও। সে বিয়ের দলিল তেতালার ঘরে, চোরা সিন্দুকের একদম নিচের খাপে, ডানদিকের খুপরিতে ভাঁজ করা আছে। খালেদ একটু পানি, পানি—পানি—পানি।

[ছুটতে ছুটতে]

ফুফু : কে ? কে ? পানি পানি করে চিৎকার করছে কে ? ভাই-ই'

চাচা : আমি সব খালেদকে বলে দিয়েছি বোন। ওকে তুই বলে দে যে ওকে আমি কোনো দিন ঠিক ঠকাতে চাইনি। তাহলে পঁচিশ বছর ধরে ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতাম না। শুধু নিজের ছেলের বিলেত যাবার খরচ যোগাবার জন্যে ওর কাছ থেকে আসল কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম মাত্র' আল্লাহ্!

খালেদ : (হাসি) লুকিয়ে ? পঁচিশ বছর ধরেও মানুষ এ রকম কথা লুকিয়ে রাখে , চাচাজান' ঢাকের শব্দ কি এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না ?

ফুফু : ঢাক ? কোন ঢাক ? আমিনকে অত করে বারণ করলাম তবু আবারও ঐ ঢাক বাজাতে শুরু করেছে ?

প্রফেসর : আমিন'

চাচা : আমিন ? ও ঢাক আমিন বাজাচ্ছিল ?

ফুফু : আর তুমি প্রলাপের ঘোরে তাই শুনে খালেদকে কতগুলো বাজে, আজগুবি কথা বলে ফেললে! সব মিছে কথা, মিছে কথা। ওর এক বর্ণও সত্য নয়।

খালেদ : (অট্টহাসি) ঢাকটা না হয় বুঝলাম ফাঁকি, কিন্তু দলিলটা ? চিলেকোঠার ঘরে, চোরা সিন্দুকে, নিচের খাপে, ডান খুপরিতে ভাঁজ করা আছে সেটা। যাই আমি ওটা সময় থাকতে নিয়ে আসি গিয়ে।

চাচা : খালেদ, দাঁড়াও। ওখানে কিচ্ছু নেই, সব মিছে কথা। মিথ্যে, মিথ্যে বকারের ঘোরে বলা।

খালেদ . সত্য না মিথ্যে তা আমি নিজেই পরখ করে দেখব, আপনার অত উত্তেজিত হবার প্রয়োজন নেই। বাধা দিতে চেষ্টা করলে বিপদ ঘটতে পারে। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন আমি দলিলটা নিয়ে আসছি।

আমিন যে! তুমি আবার ফিরে এলে যে বড়। তুমিও ওঘরে বস গিয়ে। তোমার দৌলতেই সব ঘটল কিন্তু।

আমিন : কী ? খালেদ ভাই কী বলে গেল আব্বা ? সব্বাই ওরকম করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন ? আমি কী করেছি ?

চাচা : তোমাকে খুন করব ছোকরা!

ফুফু : আমার নিষেধের পরও তুমি ওই ঢাকে হাত দিতে গেলে কোন সাহসে ?

আমিন : ঢাক ? কৈ আমি তো কোনো ঢাক বাজাইনি। ও ঢাক তো আমি বাসায় রেখে আব্বার দেরি দেখে আব্বাকে নিয়ে যেতে ফিরে এলাম।

চাচা : ও ঢাক তা হলে তুমি বাজাওনি ?

[গুম্ গুম্-গুম্ গুম্! ঢাক আবার বাজতে শুরু করেছে]

চাচা : আমায় একটু পা-নি।

[হঠাৎ খালেদের একটা প্রচণ্ড চিৎকার—ভয়ার্ত এবং বেদনাক্লিষ্ট। সঙ্গীত-তরঙ্গ সংবলিত। সিঁড়ি দিয়ে একটা মৃতদেহ গড়িয়ে পড়বার মতো আনুষঙ্গিক পতন ধ্বনি।]

খালেদ : (দূরে) রেজিনা! রেজিনা! পানি! একটু পানি! রেজি—! (স্তব্ধতা!)

চাচা : ও-কী! খালেদ চিৎকার করে উঠলো কেন ?

আমিন : আমি দেখে আসছি।

প্রফেসর : সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল মনে হলো!

ফুফু : সে-কী!

চাচা : খালেদ! খালেদ! কোনো সাড়া শব্দ নেই দেখছি আর। খালেদ! এই যে রেজিনা, আমিন— খালেদ, খালেদ কোথায় ?

রেজিনা : সিঁড়ির নিচে। ঘরে পড়ে আছে। মরবার আগে একটু রক্তবমি করেছে।

চাচা : খালেদ মারা গেছে ?

ফুফু : লাল কাজীর ঢাক! (বিকৃত হাসি) এ পরিবারের মৃত বড় ছেলের, ধর্মসঙ্গত বড় ছেলে খালেদ মারা গেছে। জমিদারির প্রধান মালিক, জ্যেষ্ঠতম জীবিত উত্তরাধিকারী খালেদ— লাল কাজীর ঢাক শুনেছে! হি হি হি।

[ঢাকের প্রবল ধ্বনি]

[ধ্বনি শেষ]

[যবনিকা]

আগামী যুদ্ধ

(কোনো ঘর নয়, ট্রেঞ্চের গহ্বরটাই রঙ্গমঞ্চ। তবে সে ট্রেঞ্চের দেয়াল, গড়ন, আকার, চেহারা সবটাই এত ঝক্‌ঝকে, মজবুত এবং ছিমছাম যে দেখলে মনে হয় যেন কোনো আধুনিক আমিরের প্রাসাদের অন্দর মহল।

একটি কিশোরী টেবিল-বাতির নিচে খাতা কলম রেখে কঠিন চিন্তায় ঠোঁট কামড়াচ্ছে। একটি মাঝ বয়েসী চাকরানি ঘরের এটা-সেটা ঝেড়ে মুছে ঠিক করে রাখছে।)

কিশোরী : (মাথা না তুলেই) কে খালা নাকি? সত্যি খালা, তোমাকেই এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলাম! (চোখ তুলে) ওহ্, তুমি! উহ্! কী মুশকিলেই যে পড়েছি!

চাকরানি : কেন কী হয়েছে?

কিশোরী : টিচারজী প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছে। যুদ্ধ কী করে শুরু হলো তার ওপর। টিচারজী ক্লাসে সবই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে, আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেছে, কিচ্ছু মনে করতে পারছি না। আচ্ছা আমরা কেন যুদ্ধ করছি একটু বলে দেবে আমায়?

চাকরানি : কেন যুদ্ধ করছি তা আমি কী করে জানব?

কিশোরী : কী সাংঘাতিক না?

চাকরানি : কি, যুদ্ধ?

কিশোরী : না না, আমি আমার প্রবন্ধটার কথা বলছি। আমার থেকে থেকে কী মনে হচ্ছে জানো দাদি? আগামী যুদ্ধগুলো যেন এত আহাম্মকিতে ভরা হয়, যাতে কাউকে কোনো দিন তার ওপর কোনো প্রবন্ধ লিখতে না হয়।

চাকরানি : পাগলী! সব যুদ্ধই তো আহাম্মকের কাণ্ড!

কিশোরী : বাহ্ তা হতে যাবে কেন? যুদ্ধ হচ্ছে— হচ্ছে।

কৈ আমরা তো তাই বলে এমন কিছু কষ্টে নেই চাকরানি। হয়তো সব্বাই এত আরামে নেই!

কিশোরী : হবেও বা। আব্বাজানের চিঠি পাই না আজ কতদিন হলো!

(কিশোরী তার লেখায় মন দেয়। চাকরানি বেরিয়ে যায়। কিশোরী কলমের গোড়া চিবুতে থাকে। হঠাৎ দরজায় ভারি পায়ের শব্দ। আজগুবি পোষাক পরা একটা লোক ঘরে ঢোকে। পরণে ময়লা পোষাক, কাঁধে ঝুলানো বন্দুক। ঘরে ঢুকেই ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে)

কিশোরী : (হতভম্ব) আপনি কে? আপনি এখানে কী চান? কোত্থেকে এসেছেন?

মানুষ : শোন কথা। উহ্! এরা কি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে নাকি?

কিশোরী : আপনি কি ছুটি নিয়েছেন নাকি ? ছুটির কাগজপত্র সঙ্গে আছে ?

মানুষ : অ্যাঁ ? ছুটি ? কীসের ছুটি ?

কিশোরী : বাহ ছুটি না নিয়ে আপনি ট্রেঞ্চে আসবেন কেন ? নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

মানুষ : (নিজেকে) আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছি না ?

কিশোরী : বাহ্। বড় মজা তো। দেখি দেখি ওটা কী এনেছেন।

মানুষ : (আরো হকচকিয়ে) কী ? কী হয়েছে ?

কিশোরী : আপনার কাঁধে ওটা কী ঝুলছে ?

মানুষ : ওহ্ ! ওটা তো একটা বন্দুক।

কিশোরী : বন্দুক ? ওটার নামই তাহলে বন্দুক ? বড় মজার তো?

মানুষ : মজার ? বন্দুকের মধ্যে আবাব মজার কী খুঁজে পেলে তুমি ?

কিশোরী : (গম্ভীর হতে চেষ্টা করে) বন্দুক দিয়ে আপনি এখানে কী কবতে চান ?

মানুষ : এ দেখছি আচ্ছা আজব মেয়ে! আমি এসেছি লড়াই কবতে—আমার দেশের শত্রুদের শেষ করতে ' এ-দেশেব যারা—

কিশোরী : মানে—আপনি এ-দেশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান ?

মানুষ : জি ঠিক তাই। আশাকরি এবাব আর ব্যাপাবটা নিশ্চযই খুব মজাব মনে হচ্ছে না!

কিশোরী : (কোনো বকমে হাসি চেপে) যুদ্ধ করবেন—বন্দুক দিয়ে ?... হি-হি-হি...আর সেই জন্য এসেছেন ট্রেঞ্চে! হি-হি-হি!

মানুষ : ভালো মুসিবতের মধ্যে পড়লাম দেখছি! এ জাযগার ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত পাগল হয়ে গেছে নাকি'

কিশোরী : (ভাবখানা আম্মাজানের অবর্তমানে আমিই গৃহকর্ত্রী) আপনি দয়া করে আমাদের এখানেই উঠেছেন, সে জন্য আমরা সবাই খুব সুখী হয়েছি। বিশেষ করে বন্দুকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখে খালাম্মা নিশ্চযই আরো খুশি হবেন। আপনি জানেন না আমাদের এখানে ইঁদুরের বড় উৎপাত! আর ইঁদুর আমরা কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আপনি এসেছেন, বড় ভালো হয়েছে। আমাদেব ইঁদুরগুলো সব আপনার বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলবেন। খালাম্মা সব সময়ে বলেন, ইঁদুর বড় বজ্জাৎ। বিষের ওষুধ দিয়ে ওগুলোকে কাবু করা যাবে না। দরকার একজন বন্দুকওয়ালা আদ্‌মি—যে টোটা ভরে ওঁৎ পেতে থাকবে—শয়তানগুলো গর্তের মধ্য থেকে মাথা একটু বার করেছে—আর—গুড়ুম! (লোকটার স্তম্ভিত ভাবকে আমল না দিয়ে) আপনার বন্দুকে টোটা ভরা আছে তো ? ইঁদুর কিন্তু বড় বজ্জাৎ। একটু বেখেয়াল হয়েছেন কী—ফুড়ুত—কোনো পাত্তা পাবেন না আর। ঐ যে টেবিলের কোণে যে একটু গর্তের মতোন দেখা যাচ্ছে—তাকান ঐ বরাবর—তাকান, তা

মানুষ : (আহত কণ্ঠে) ইঁদুর মারার জন্য আমি আসি নি। ঐ এরাদা নিয়ে এতদূর পথ পাড়ি দিই নি। ও কর্ম আমি আমার ঘরে বসেও সমাপন কবতে পারতাম।

কিশোরী : বারে, তাহলে আর এখানে এলেন কেন ? আপনার স্ত্রীকে দেখতে এসেছেন ?

মানুষ : হায় খোদা! আমার নিজের ঘরে বিবির এতই অভাব নাকি ?

কিশোরী : মানে—ইয়ে—মানে আপনার ঘরে কি অনেকগুলো বিবি রয়েছে নাকি ?

মানুষ : জি!

কিশোবী : সবগুলো—বিয়ে করা ?

মানুষ : তা নয় তো কী ধরে রাখা নাকি ? এ মেয়ে বলে কী'

কিশোরী : কতগুলো ?

মানুষ . পাঁচটা।

কিশোরী : বা-প-রে! আপনি তাই বুঝি এখানে পালিয়ে এসেছেন ?

মানুষ : (কোনো বকমে নিজেকে সংযত বেখে) আমি এসেছি লড়াই করতে। আমার মাতৃভূমিব শত্রুর বিরুদ্ধে। আমি এদেশের সন্তান। বাড়ি আমাব দক্ষিণ মুলুকে। সব ছেড়েছুড়ে ছুটে এসেছি নিজের দেশেব সেবায় প্রাণ উৎসর্গ কবতে। ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিযে এই উত্তব সীমান্তে এসে হাজির হয়েছি। ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে তাকাই নি। পথে যার সঙ্গেই দেখা হযেছে— একটি মাত্র প্রশ্ন কবেছি : সীমান্ত কোন দিকে ? হুম ! এখন সীমান্তে পৌছে আমাকে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে— পাগল হয়ে যাই নি তো ?

(ধূসর শাড়িতে জড়ানো, সুদেহী, চশমা পরা এক পরিণত বযেসেব মহিলার প্রবেশ)

মহিলা : কী ব্যাপাব— কী হয়েছে ?

কিশোরী : ও আম্মা। দেখ কী মজার কাণ্ড ' এ লোকটাব বাড়ি দক্ষিণ দেশে। বিয়ে করেছে পাঁচটা, সঙ্গে বন্দুক আছে। অথচ বলে কিনা ও-দেশের লোক মারবে—কিন্তু ইঁদুর কিছুতেই মারতে রাজি নয়!

মানুষ : আরেকটা মেয়ে লোক! এখানে এত মেয়েলোক এল কোত্থেকে ? শেষে কি মেয়েরাও যুদ্ধে নেবেছে নাকি ?

আম্মা : দেখে মনে হচ্ছে আপনি এ-দেশেরই লোক। অনেককাল বিদেশে কাটিয়ে এখন দেশের সেবা কবার ইচ্ছে হয়েছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এখানে কেন ? যদি কারো কথা শুনে এসে থাকেন—তাহলে বলব সে আপনাকে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছে।

কিশোবী : কাকে কী বলছ আম্মা! এ লোক তো কাউকে কিছু জিজ্ঞেসই কবে নি। ইনি যে একেবারে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে এখানে এসে হাজির

হয়েছেন। (লোকটাকে! খুব পাকামীর সঙ্গে) আপনার উচিত ছিল প্রথমেই সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা।

আম্মা : তুই থাম দেখি বুলবুলী! (লোকটাকে) আপনি বসুন। নিশ্চয় খুব থ'কে গেছেন। একটু চা করে দেব ?

মানুষ : না। কোনো দরকার নেই। ধন্যবাদ। আপনি দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন কি—এখানকার কাণ্ডকারখানাটা কী ? দেখেশুনে আমার তো মনে হচ্ছে দুনিয়াটা নিশ্চয়ই ঠ্যাং ওপরের দিকে তুলে দিয়ে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে আছে।

আম্মা : নিজের দেশের জন্য এগিয়ে এসেছেন—এটা বীরের মতোই কাজ করেছেন।

মানুষ : দেখুন শিকার করা আমাদের অনেক দিনের নেশা। পাকা শিকারিও বটে। কিন্তু দোহাই আপনার, একটু বলে দেবেন কি— আমার সাহস, আমার শক্তি, আমার নিশানা— কোথায় গেলে কাজে লাগাতে পারি ? এখানে তো দেখছি শুধু মেয়েলোক! আমার কওমের আসল ভাইরা, যোদ্ধারা, পুরুষরা— তারা সব গেল কোথায় ?

আম্মা : যে যার বাড়িতেই আছে। শহরে, গাঁয়ে, অফিসে, কলকারখানায়। সেখানেই তো ওদের আসল জায়গা। রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছেন ?

মানুষ : রসায়নশাস্ত্র ? নামটা তো আগে শুনিনি কোনো দিন। কী ব্যাপার সেটা ?

আম্মা : বন্দুকটা রেখে দিন। বন্দুক দিয়ে আজকাল এমন কী কাজটাই বা আর হচ্ছে। যে যুদ্ধে এখনো আমরা জড়িয়ে আছি—এটা প্রধানত গ্যাসযুদ্ধ— অফুরন্ত গ্যাসসম্পদ নিয়ে পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা। তোমার কর্তব্য শহরে গিয়ে কিছুকাল রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করা। প্রায় রোজ-ই একটা না একটা নতুন মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে। সে জন্যই তো শহরের লোক আজকাল সব্বাই লিটমাস কাগজ সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে।

মানুষ : কী যা-তা বকছেন। আমি লড়াই করতে চাই— রসায়নশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে চাই না। আমার মুঠোর মধ্যে চাই শক্ত ভদ্র অস্ত্র, যা দিয়ে আমি ও-দেশের মানুষকে শেষ করে দিতে পারি !

আম্মা : আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে। যদি আর বছর খানেক আগেও আসতেন, হয়তো কাজে লাগানো চলত। ঘর পাহারাদার কিংবা শত্রু পক্ষের বোমারু উড়োজাহাজ ছেঁদা করার জন্য আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নে'য়া যেত। এখন তো সব উল্টে গেছে। বোমা ফেলতে হলে কেউ আজকাল তার সঙ্গে আর আসে না—বোমা তো এখন রকেটের ধাক্কাতেই চলে। বোমা ছুঁড়ল ওরা ওদের দেশে বসে—সে বোমা এসে ফাটলো আমাদের দেশের শহরে। সে বোমার আবার এমন গ্যাস—যে খালি চোখে

তাব কিছুই দেখা যায় না।... এ খবরও শোনেন নি কোনো দিন? এ রকম তো আজকাল হরদম ঘটছে। সে বোমাগুলো এত উঁচু দিযে ছোটে যে, খালি চোখে ওদের দেখাই যায না—কেবল কান পাতলে একটা শোঁ শোঁ শব্দ কখনও কখনও শোনা যায়। অবশ্য শব্দ শুনে সে বোমা কোন দিকে ছুটছে তার কিছুই আন্দাজ করা যায় না—আমাদের ওপরই ফাটবে না ও-দেশে গিয়ে পড়বে। আপনি অনেক জানেন? বাঁকা রেখার গণিত? প্যারাবোলার সমীকরণ জানেন? ট্রাজেক্টরি? ব্যালিস্টিক্স কাকে বলে বোঝেন? আরম্ভিকর বেগ আর গতিকোণ দেয়া থাকলে অঙ্ক কষে ওর পতনবিন্দু বার করতে পারেন?

মানুষ : অ্যাঁ? এ সব কী বলছেন আপনি? অঙ্ক? হিসেব? আমি কি একটা নাম্‌তার বই নাকি?... বলে কী এরা? ব্যালিস্টিকস্! বলে কিনা শত্রু না দেখে আকাশে গুলি ছুঁড়তে হবে। সব পাগল, পাগল হয়ে গেছে!

আম্মা : (শান্ত) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আপনি ভুল করেছেন।

মানুষ : আমি এ দেশেব লোক। এ-দেশই আমাব ঘর।

আম্মা : নিজেব বিবি-বাল-বাচ্চা নিয়ে থাকলেই ভালো করতেন।

মানুষ : এর মধ্যে বিবির কথা এল কোত্থেকে?

কিশোরী : জানো আম্মা পাঁচ পাঁচটা আছে ওর।

আম্মা : তুই থাম বুলবুলী। সত্যি তো আপনি ঘরে নেই, এখন আপনার বিবিদেব কী অবস্থা যাচ্ছে কে জানে।

মানুষ : লড়াই করছে, মানে ঝগড়া করছে। সে ওরা আমি ঘবে থাকলেও কবে। সে জন্য আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আপনি ববঞ্চ দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন, আপনারা এখানে কী কবছেন? এই যুদ্ধ ফ্রন্টে শত্রুর মুখোমুখি এত মেয়ে মানুষ কেন?

আম্মা : কারণ এটাই হলো সবচেয়ে নিরাপদ জাযগা। আমাদের ট্রেঞ্চের এই কংক্রিটের যে দেয়াল দেখছেন, এগুলো যে কোনো দুর্গেব চেয়ে বেশি মজবুত। বোমা মেরে এই গাঁথুনির কিছু করতে পাববে না। দরকার হলে এর ছাদের ঢাক্‌নি এমন করে সেঁটে দেয়া যায় যে, কোনো গ্যাস ঢুকতে পারবে না। এগুলো সব তৈরি হয়েছিল এ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে—তখনও মানুষ ট্রেঞ্চে বসে যুদ্ধ কবত।

কিশোরী : ও আম্মা আমাকে তো ওসব কথা দিয়েই একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে—যুদ্ধের গোড়ার ইতিহাস। টিচারজী বলে দিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহস, আত্মত্যাগ আর বীবত্বের কথা যেন খুব ভালো করে বর্ণনা করি। প্রথম গ্যাসযুদ্ধের কথাটাও লিখতে হবে। সেটা কীরকম হয়েছিল আম্মা?

আম্মা : (সাড়ম্বরে) যুদ্ধ যখন শুরু হয় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ তখনও নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধ-ফ্রন্ট তৈরি হলো, দু'দিকেই। তৈরি হলো মুখোমুখি ট্রেঞ্চ। কিন্তু কেউ আর এগুতে পারে না। পিছু হটতেও রাজি নয়। আক্রমণের কোনো অর্থই

থাকল না আর। সৈন্যরা বসে বসে আর কী করবে—নিজের ট্রেঞ্চকে যত রকমে আরো উন্নততরো করে তোলা যায়; সে দিকে মন দিল। তৈরি করল এমন ট্রেঞ্চ যা রাজার পুরীর চেয়েও সুন্দর, দুর্গের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তারপর বসে থাকতে থাকতে সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে শেষে বিরক্ত হয়েই গ্যাসের যুদ্ধ শুরু করে দিল।

কিশোরী : (লিখতে শুরু) "বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে শেষে বিরক্ত হয়েই আমরা—"

আম্মা : আরে করিস কী পাগলী, ওসব কথা লিখতে হয় নাকি ?

কিশোরী : লিখব না কেন ?

আম্মা : টিচারজীর হাতে তা হলে আর পাশ করতে হবে না।

কিশোরী : বাহ্ পাশ করব না কেন ? সত্য কথা লিখব না তা হলে ? এই ট্রেঞ্চের মধ্যে একঘেয়ে দিন গুণতে আমারও কি ছাই ভালো লাগে। এর চেয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে রোজই কত মজার মজার কাণ্ড ঘটছে। পাশের ট্রেঞ্চের লম্বা বেণীর কাছে ওর বাবার গল্প শুনলাম। জানো আম্মা, ওর আব্বা নাকি সেদিন বাড়িতে বসে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে কী, চায়ের রংটা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে নীল্‌চে হয়ে যাচ্ছে। এই না দেখে লম্বা বেণীর বাবা তাড়াতাড়ি করে গ্যাসমুখোস পরে ফেলল। ভাগ্যিস চায়ের রং বদলানোটুকু লক্ষ করেছিলেন। নইলে আরেকটু হলে অক্কা পেয়েছিলেন আর কী! কী অদ্ভুত কাণ্ডটা না আম্মা ?

আম্মা : তুমি কী লিখবে বলে দিচ্ছি। "আমাদের দেশের বিরুদ্ধে সবাই যখন অস্ত্রধারণ করল তখন আন্তর্জাতিক মৈত্রীসংঘেরও পতন ঘটল।"

কিশোরী : "তখন আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘেরও পতন ঘটল।"

আম্মা : না, তার চেয়ে বরঞ্চ লেখ মৈত্রীসংঘে ভাঙন ধরল—না, লেখ, তখন সে মৈত্রীসংঘের কোনো অর্থ থাকল না আর। হ্যাঁ, এইটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

কিশোরী : "... কোনো অর্থ থাকল না আর।"

আম্মা : "চারদিক থেকে আমাদের দেশ শত্রু পরিবেষ্টিত। পথ আটকে আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। গ্যাসবোমার ব্যবহার ছাড়া তখন আমাদের অন্যকোনো পথ আর খোলা রইল না। দুনিয়ার সেরা রসায়নাগার ছিল আমাদের দেশে। গ্যাসবোমা হয়ে দাঁড়াল আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মরা বাঁচার যোগস্থলে দাঁড়িয়ে এ পথই আমরা তখন গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।"

কিশোরী : কী যুক্তি! তারপরই বোধহয় সবকিছুই খুব মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

আম্মা : ছিঃ। অমন করে বলতে হয় না। তুমি কোনো জিনিস যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখোনি এখনো। তোমার বাবা এখন দেশের বাড়িতে বসে আছেন। যে কোনো সময়ে অদৃশ্য, নীরব গ্যাসবোমার বিষ ওর ঘরে ঢুকে

পড়তে পারে— সে বিষাক্ত বাষ্প ধরা ছোঁয়ার বাইরে, চোখে দেখা যায় না— নাকে গেল, ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ! (গাঢ় গলায়) আমাদের যোদ্ধাবা সব কলে পড়া ইঁদুরের মতো, জানে না ওদের বিষ খাইয়ে মারা হবে না পানিতে ডুবিয়ে।

কিশোরী : "...কলে পড়া ইঁদুরের মতো"

আম্মা : কী করছিস, ওটাও লিখছিস নাকি ?

কিশোরী : এটাও লিখব না ? কী লিখব তাহলে ?

আম্মা : লিখ যে তারা ছিল বীর, অঙ্ক আর রসায়নশাস্ত্রে বড় বড় পণ্ডিত। যারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নতুন মারাত্মক গ্যাস আবিষ্কার করেছেন আবাব সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের গ্যাসকে কী করে জয় করা যায় তাব কৌশলও আবিষ্কার কবেছেন। হয়তো শিগ্‌গিরই এমন একদিন আসবে— (আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ)

কিশোবী : কেমন দিন আম্মা ?

আম্মা : (সামলে নিয়ে) ভবিষ্যৎই বলে দেবে। সে কথা থাক এখন। তোমার প্রবন্ধে সে কথা না থাকলেও চলবে। সত্য কোনটা বোঝা বড় শক্ত বড়রা পর্যন্ত সব সময়ে পরিষ্কাব করে বুঝতে পারে না। তুমি লিখে যাও কী করে ট্রেঞ্চের যুদ্ধ গ্যাসবোমার যুদ্ধে পরিবর্তিত হলো। প্রথমে বর্ণনা করো কী কবে প্রথম বোমা নগরে নগরে ফাটল আর মরল অগুনতি শিশু আর মেয়ে। অথচ আসল সৈন্য যারা গুলিগোলা নিয়ে মঞ্চে বসেছিল তাদেব গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না। দুই যুদ্ধমান সৈনিক দল যেন পরামর্শ করে ঠিক করেছে—যুদ্ধ ফ্রন্টে কেউ কাউকে আঘাত করবে না। তাবা বোমা ছুঁড়ল মাথার ওপর দিয়েই—কিছু পড়ল অনেক দূবে। এই তো— এরপরও অনেক কিছু তুমিও জানো। পাশের ঘরে বসে লিখতে থাকো গিয়ে।

কিশোরী : (লেখার সরঞ্জাম নিয়ে যেতে যেতে) ইঁদুর দেখা গেলে আমায় খবব দিও কিন্তু। গুলি করে ইঁদুর মারা দেখতে কী মজাই না লাগবে! আপনার বন্দুকের শব্দ খুব জোরে হয় তো।

আম্মা : বুলবুলী, তুমি যাও এখন।

কিশোরী : যাচ্ছি! আমায় ডাকতে ভুলে যেও না যেন। (প্রস্থান)

আম্মা : আপনি কী করে যে এখানে এসে পৌছলেন ভেবে অবাক হয়ে যাই। সঙ্গে না ছিল গ্যাসমুখোস, না ছিল—

মানুষ : (অসহ্য!) না কিছু ছিল না।

আম্মা : এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ? কিছু আপনি শেখেন নি। কোনো রকম অভিজ্ঞতাও নেই আপনার। শহরে ফিরে যাবার পথে কিছু বুঝে উঠবার আগেই হয়তো মারা পড়বেন।

মানুষ : ফিরে যাব কেন ? এগিয়ে যাব। ঢুকে পড়ব শত্রু সীমান্তে।

আম্মা : তাতে লাভ কী হবে। সীমান্তে তো শুধু মেয়েলোক থাকে, আমাদের মতোই।

মানুষ : আবার মেয়েলোক। দুনিয়ায় পুরুষ আদমি শেষ হয়ে গেল নাকি। যুদ্ধক্ষেত্রেও শুধু মেয়েলোক। এর চেয়ে যে ঘরে বসে—

আম্মা : হ্যাঁ— ঠিকই ধরেছেন। আপনার পক্ষে সেটাই উচিত ছিল।

মানুষ : (পাগলপ্রায় মাথাব চুল ছিঁড়ে) আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাতাস চাই। খোলা হাওয়া। দরজা কোন দিকে আপনাদেব ? দরজা—

আম্মা : একি কোথায় চল্লেন ? বেশিক্ষণ দেরি কববেন না যেন। আপনার জন্য কফি তৈরি করে রাখব।

মানুষ : যদি ফিরে আসি খাওয়া যাবে। (বেগে প্রস্থান)

(খানিকক্ষণ নীরব। মাঝে মাঝে দূরে রকেটের হুস-শাঁইইই শব্দ। চাকরানির প্রবেশ)

আম্মা : কফিটা করতে খুব দেরি হবে কি ?

চাকরানি : পানি তো ফুটে গেছে। বললেই নিয়ে আসব! কিছু কেক কেটে দেব ?

আম্মা : ঘরের তৈরি কিছু কি বাকী আছে এখনও ?

চাকরানি : অনেক।

আম্মা : আমার দুষ্টু ছেলেটা কোথায় গেল।

চাকরানি : খাদের মধ্যেই কোথাও খেলছে হয়তো।

আম্মা : কোথায় কার সঙ্গে খেলছে কে জানে। নাহ্ এ গোঁয়াব ছেলেটাকে নিয়ে আর পারলাম না।

চাকরানি : কী আবার হবে মা। কামানগুলোব কাছে একটু আগে আমি ওকে দেখে এসেছি।

আম্মা : কামানের কাছে ? (ভীত)

চাকরানি : একটা কামানের ওপর পা ছড়িয়ে খোকা খেলছে।

আম্মা : না না। সে কী ? কামান কী খেলার জিনিস নাকি। যদি একটা কিছু হয়ে যায়।

চাকরানি : হবে আবার কী মা। গোলা বারুদ নেই এমনি কতদিন ধরে ওগুলো পড়ে রয়েছে। কবে যে ওর মধ্য দিয়ে আগুন বেরুতো সে কথা মনেও নেই এখন।

আম্মা : না না তবু—ও ঠিক হচ্ছে না।

(সুশ্রী এক তন্বীর প্রবেশ। পোশাক সাধারণ হলেও চোখে পড়ার মতো।)

তন্বী : আপা আপা ও এল বলে! ও সত্যি সত্যি আমাদের এখানে কফি খাবে। ওর কাছে শুনলাম তোমার সঙ্গে নাকি ইতোমধ্যে ওর আলাপ হয়ে গেছে। কী আলাপ করলে তোমরা, আমাকে ডাকলে না কেন ?

আম্মা : কী আবোল তাবোল বকছিস! কার কথা বলছিস ?

তন্বী : বাহ্ সে লোকটার কথা! ঐ যে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভেসে ভেসে যে এল। কী অদ্ভুত আশ্চর্য মানুষ!

আম্মা : ওহ। এরই মধ্যে পরিচয় করে নিয়েছ তাহলে!

তন্বী : হুহু ওর আসল নাম জংবাহাদুর। আমি সংবাদুড় বলে ডাকি। একটুও রাগ করল না সে জন্য। আমি যাই। এইবার পোষাকটা একটু বদলে আসি। (ছুটে বেরিয়ে গেল)

আম্মা : (হতাশায় মাথা নেড়ে) তিনটে পেয়ালা দিসরে!

চাকরানি : (স্পষ্ট—উত্তেজনা) কেউ আসবে নাকি ?

আম্মা : শুনতেই তো পেলি সব !

চাকরানি : কম বয়েসী পুরুষ মানুষ ?

আম্মা : না। মাঝ বয়েসী। তবে লোক ঝাঁঝালো।

চাকরানি : ওহ! আমি কাপড়টা একটু বদলে আসব মা ?

আম্মা : যা আছে তাই থাক। ওতে চোখে পড়ার ভয় কম থাকবে। লোকটার ঘরে পাঁচজন আছে।

চাকরানি : অ্যাঁ পাঁচ বিবি!... ওর দেশ কোথায় ?

আম্মা : দক্ষিণ মুলুকে।

চাকরানি : সে তো অসভ্যদের দেশ। ওরা জ্যান্ত মানুষ খায়। এতদিনে ওর পাঁচ বিবির মধ্যে কেউ হয়তো এক আধজনকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, সে ফাঁক ভরবার জন্য লোকটা যদি আবার বিবি খোঁজে ? পাঁচ বিবি! বাব্বা! লোকটার জীবন কেমন করেই না জানি ওরা চালায়!

(চাকরানি মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। পেছন পেছন আম্মাও। এক মিনিটের জন্য মঞ্চ অন্ধকার। আবার আলো জ্বলতেই দেখা যাবে সুসজ্জিতা তন্বী আর লোকটা কফি খাচ্ছে)।

তন্বী : আপনি আশ্চর্য লোক।

মানুষ : কেকটা তো খেতে মন্দ লাগছে না।

তন্বী : কী করে এতদূর পথ অতিক্রম করে আমাদের কাছে এলে সে গল্প শোনাবে না আমাকে ? নিশ্চয়ই পথে কত কত রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে ?

মানুষ : তা হ্যাঁ— এক রকম হয়েছে বৈকি।

তন্বী : সাগরের বুকে ছোট নৌকায়। একা তুমি কী অদ্ভুত সাগরে ভাসতে।

মানুষ : আরো কেক আছে নাকি ?

তন্বী : এই নাও।... চার দিকে নীল ঢেউ। পাশে কেউ নেই। এক মুহূর্তের জন্যও তোমার খুব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেনি ? মানে তোমার অমন গমগমে সংসারেব পর— মানে তোমরা দক্ষিণ মুলুকের উষ্ণাঞ্চলের লোকরা শুনেছি— একটু

বেশি— বিশেষ করে পাঁচ বিবিতে অভ্যেস হয়ে যাবার পর হঠাৎ অত নিঃসঙ্গতা কি একটু বেশি—

মানুষ : তা তো এক রকম লেগেছি বৈকি!

তন্বী : শুধু পানি আর পানি। দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায় না! রাতের পব রাত পার হয়ে যাচ্ছে। জোৎস্না ঢেউয়ে আছড়ে মরছে। (লোকটার ওপর কোনো আসর হয় না) আচ্ছা, এখানে নেবেও কি তুমি কারো দিকে তাকাওনি। কোনো পুরুষ— কোনো মেয়েমানুষ—

মানুষ : কারো দিকেই নয়। রাস্তায় তেমন কোনো মেয়েলোককে আমি দেখিনি।

তন্বী : কিন্তু যখন তুমি এসে আমাদের এখানে পৌঁছলে! তখন ? অন্তহীন সমুদ্রের নিঃসঙ্গ বুকে যে বেদনা তুমি অনুভব করেছিলে তার কোনো মুক্তির ইঙ্গিত কি তুমি তখনও খুঁজে পাও নি ? সত্যি কি পাও নি ? লজ্জা কীসের! আমাকে বলতে লজ্জা কীসের!

মানুষ : উম্ ?

তন্বী : (আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে) তোমার সে বেদনা আমার কাছে কি অব্যক্ত থাকতে পারে ? আমার কাছে প্রকাশ করো। হয়তো আমি তোমাকে— না মানে তা কেন— হয়তো তুমিই তাহলে কোনো এক করুণ তন্বীকে— তাব মানে ইয়ে— তোমরা জানো ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে সঙ্গীহীন দীর্ঘ রাত ও জীবন কী বিভৎস অভিশাপ।... আমি, ক্ষমা করো আমায়।

মানুষ : মদের বোতলটা এগিয়ে দাও তো।

তন্বী : মদের বোতল ? অ্যাঁ ? ওহ! না মদ আমাদের আর বেশি নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন— আমার ভুল হয়ে গেছে।

(হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ গুড়ুম! গুলির আওয়াজ)

মানুষ : (লাফিয়ে উঠে) গুলিব আওয়াজ! গুলি করার মতো তাহলে কিছু পাওয়া গেছে। আমি যাই। আমার ডাক এসেছে।

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

আম্মা : (ভযার্ত চেহারা। ছুটে ঢোকে) শব্দ— কীসের শব্দ হলো ওটা ?

তন্বী : কোথাও কেউ গুলি ছুঁড়েছে হয়তো। শব্দ শুনে তাই মনে হলো।

আম্মা : কে, কে, এ কাজ করেছে ? কী করে হলো এ রকম ? গত এক বছবের মধ্যে কোনো দিনও এমন অঘটন এদিকে হয় নি।

চাকবানি : (একটি কিশোবকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে) এই সেই খুনে ছেলেটা। সারা ট্রেঞ্চের বাসিন্দাদের মধ্যে ওলট পালট হয়ে গেছে।

ছেলে মেশিনগান নিয়ে খেলছিল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে এই কাণ্ড। গুলি ভবা ছিল।

আম্মা : (কিশোরকে) এদিকে এস তুমি। তোমায় মজা দেখাচ্ছি, পাজি কোথাকার।... উহ! কী সাংঘাতিক, মেশিনগান নিয়ে খেলা।

কিশোব : আমার কিন্তু দোষ নাই আম্মা। পশ্চিমের ট্রেঞ্চের ঐ যে ছেলেটা, ঐ না হঠাৎ ঘোড়াটা টিপে বসল। আমায় মেরো না আম্মা।

আম্মা : মারব না আবার। গুলি যদি কারও গায়ে গিয়ে লাগত ? (চাকবানি) কোনো খুন জখম হয়ে নি তো ?

চাকবানি : কে জানে ?

কিশোব : কারো দিকে গুলি ছুটে যায়নি আম্মা। নল আকাশের দিকে উঁচু করা ছিল একটু ঐ দিকে হেলান দেয়া।

আম্মা : কী বললি ? কোন দিকে ? খেয়েছে রে খেয়েছে। ও দিকে তো ও দেশের সীমান্ত, (চাকরানি) তুমি শিগ্‌গির যেয়ে একবার খোঁজ করো তো। সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশ হয়েছে ' (চাকরানি চলে যায়। দুষ্ট ছেলেটা একটু জড়সড়ো হয়ে কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। আম্মা উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করছে।)

কিশোব : (কান্না কান্না) আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না মা। আর কোনো দিন আমি এ বকম করব না।

আম্মা : যদি সত্যি তোর গুলি ও দেশের কারো গায়ে গিযে লেগে থাকে— ওবা আমাদের কী ভাববে বল তো ?

কিশোব : আমি জেনে শুনে করি নি। (কেঁদে ফেলে) হয়তো আমার গুলি লেগেই জুলি আর জিন মবে গেছে। কে জানে ? সব দোষ তো ঐ ছেলেটাব, আমি কি জানতাম যে টোটা—

আম্মা : (বাধা দিয়ে) কী বললি ? জুলি, জিন—এরা কারা ?

কিশোর : ওদের বাড়ি ওদেশে। ওপারের ট্রেঞ্চে থাকে। আমবা এক সঙ্গে খেলতাম— (ফুঁপিয়ে উঠে)।

আম্মা : বাহ্ চমৎকার! তারপর ?

কিশোর : আমবা লুকিয়ে লুকিয়ে সীমান্ত ডিঙিয়ে একত্র হতাম। (আম্মা হতবাক')

চাকবানি : (ছুটে ঢোকে) মা মা কে জানি আসছে। ওপাব থেকে। ও দেশের মেয়েলোক। হাতে সাদা নিশান। হায় কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা। ওই সীমান্তের ট্রেঞ্চ থেকে আমাদেব দিকে ছুটে আসছে।

মানুষ : (উল্লসিত) সাদা পতাকা' সন্ধি, সন্ধি চায় ওবা কাপুরুষ এক গুলিব চোটেই আত্মসমর্পণ করতে ছুটে আসছে।

কিশোর : (কিছুক্ষণ আগেই অলক্ষ্যে ঢুকেছে) আম্মা যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেল নাকি ?

মানুষ . (যেন সব ঘটনাব সেই আসল সমঝদাব) সন্ধিব প্রস্তাব আমি আলোচনা কবব। ওসব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমবা দূবে থেকো আমার সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না।

(জং বাহাদুরের প্রস্থান)

আম্মা : কী হবে। কী হবে এখন ? পাজি ছেলে তোর গুলি যদি সত্যি ওদের কারো গায়ে গিয়ে লেগে থাকে তাহলে এখন কী হবে ?

কিশোর : (ডুকরে ডুকরে) এমন কাজ আমি আর কক্ষণো করব না, কক্ষণো না।

মানুষ : (নেপথ্যে ঘোষণা করে) আসুন এই পথে আসুন। (হাতে সাদা নিশান, পোষাক আলাদা ধরনের, একজন ওদেশের মেয়ে প্রবেশ করে। আঁটো আঁটো সুঠাম মহিলা)

ওদেশের মেয়ে : (উচ্চারণে বিজাতীয় টান) এই যে সব্বাই ভালো আছেন আপনুরা ? আমি শুনছি উকটা দুষ্টু ছেলেই নাকি সব নুষ্টের গুড়া। আমরা সব্বাই কু ভুয়ী পুয়াছিলাম। ঐটুই সে ছেলুটা নুকি ? (এগিয়ে যায়)

আম্মা : খোকা, আদাব দাও। ক্ষমা চাও ওর কাছে।

কিশোর : আমি তো ওনাকে চিনি আম্মা। উনি তো জুলির মা। ও দেশে গিযে যখন একদিন নুকিয়ে নুকিয়ে আমরা খেলছিলাম তখন জুলি দূর থেকে ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

ওদেশের মেয়ে : তুমি তাহলে আমুকে চেনু ? আমুদের ওদুকে তাহলে তুমি যাও। কুই জুলিত কোনুদিন সে কথা আমুকে বুলে নি ?

কিশোব : ভযে আমবা কাউকে জানাতাম না, যদি বারণ করে দিন আপনারা।

মানুষ : (গলা খাকবা দিয়ে কিশোরকে) তোমার বন্ধু— ঐ যে কী একটা নাম বললে তাব— সেও কি আমাদের ট্রেঞ্চেব মধ্যে আসত নাকি ?

কিশোব · নিশ্চযই। প্রাযই আসে। আমবা একসঙ্গে খেলি যে।

মানুষ গুপ্তচর। গুপ্তচবের কারসাজি এগুলো। হায় খোদা এদের কি কোনো দিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না।

তন্বী সং-বাহাদুর যাতা বকো না। গুপ্তচবে গুপ্তামি করার মতো না এদিকে কিছু আছে না ওদিকে কিছু হয়েছে। ঠিক বলি নি ?

ও-মেয়ে . একশু-বুব (কিশোবকে) তুমি যদি সুত্যি সুত্যি আমুর মেযুর বন্ধু হও— কুনু তাহলে তুমি তুব—তুমি তুর শুন্দু টু কি যেনু—

তন্বী · ক্ষতি অমঙ্গল।

ও-মেয়ে : হ্যাঁ হ্যাঁ। ও ঠিক না ?

কিশোর আমি ইচ্ছে করে ছুঁড়িনি। হঠাৎ ছুটে গিয়েছিল। আমি নিজে ভয়ে কেঁদে ফেলিনি ?

আম্মা আপনার দিকেব কেউ আহত হয় নি তো ?

ও-মেয়ে : কেউ না। রুদেব মুধ্যে কাপুড় শুকুতে দিছুলুম তার একটা একটু ফুটু হযেছে।

আম্মা আমবা আপনাকে একটা নতুন কাপড় তৈরি করে দেব।

ও-মেযে কেনু এসুব কথা বলুছেন ? আমুবাত প্রথুমেই বুঝুছিলুম যে নিশ্চই কোনু ভুলে ওটা ফুটুছে। তবু ওরা আমুকে পাঠুছে ভালু করে শুনু যেতে

আম্মা : আপনাদের এ-ব্যবহারে আমরা সত্যি মুগ্ধ। বসুন। এক পেয়ালা কফি খান আমাদের সঙ্গে।

ও-মেয়ে : একশু বুর।

আম্মা : (চাকরানিকে) ওঁকে এক পেয়ালা কফি এনে দাও। তারপর একবার পোস্ট অফিসে যেয়ে দেখে এস আমাদের কোনো ডাক আছে নাকি।

(চাকরানি কফি ঢেলে চলে যাবে)

ও-মেয়ে : আপ্‌নুদের খাবার ব্যবস্থাত বুড় ভালু। কী চমুৎকার কুরে সুজিয়েছেন সব কিছু। এটা কী ? কুক্! আহ! বিদেশী কুক কতুদিন খাই নি।

আম্মা : খান তাহলে ভালো করে খান।

ও-মেয়ে : একশু-বুর (বসে পড়ে)

তন্বী : আপনি দেখছি আমাদের ভাষাতেও খুব চমৎকার কথা বলতে পারেন।

ও-মেয়ে : আমু যে এইখানকাব কলুজ্যে পুড়েছি। সে যুদ্ধুব অনেক আগে (হঠাৎ উচ্ছ্বসিত)। আরে আপুনার পোষুকটাত বড় সুন্দর।

তন্বী · আমাব নিজ হাতে তৈরি।

ও-মেযে : চমুৎকার। পাট্যার্নটা আছে তু। আমুকে একু দিনের জনু দিতে হবে। বড় খুশি হলুম, বড় খুশি হলুম। (আম্মাকে) আবে আপুনি উহা কি শিলুই করছেন ? বাহ্ কী চমৎকার। নিজে ঐ নক্‌শা বুনুছিল ? নিজেব জনু ? ওটা কী ?

আম্মা : আমাব স্বামীর জন্য তৈরি কবছি। নতুন ডিজাইনের একটা গ্যাসমুখোস।

ও-মেযে : শিলুইতে নতুন ডিজাইন দেখুলে আমু একিবুরে পুষগুল হযে যাই। আপুনার স্বামী দেখে নিশ্চই খুবু খুশু হবুন! কী চমুৎকার ?

মানুষ : (ক্ষেপে) বাবে কুকিল। কেবল কু-কু কবে।

ও-মেয়ে : (ঘুরে তাকায। হেসে) বুলুলেন ?

মানুষ : প্রস্তাব পেশ করবেন কখন ? অনেকক্ষণ ধৈর্য ধবে বসে রয়েছি। আব সহ্য হচ্ছে না। প্রস্তাব পেশ করুন।

ও-মেয়ে : প্রস্তুবু ? কীসের প্রস্তুবু ? কী বুলুছুন আপনি ? দুষ্টু ছুলুটা ত বুলুছে এমুন কাজ আব কুখুনু কুরুবু না! বুলুনি তুমি খুকু ?

খোকা : ঝকমক।

ও মেয়ে : বাহ্ কী চমৎকার নাম। ঝুকুমুকু! (লোকটাকে) আপনার নাম কী ?

তন্বী : আমি ডাকি সং-বাদুড় বলে। নিজে পরিচয় দেয় জং-বাহাদুর বলে।

ও-মেয়ে : জুংবুং দুহুর! বাহ্ এটুও কী চমৎকার নাম। জুংবুং দুহুর অপুনি আমুদের উদিকে বেড়াতে আসুবেন একুদিন ? দুনিয়ার সেরা স্পমুয়া আমুরা খেতু দুবু আপুনাকে।

মানুষ : (সুব বদলে) সত্যি ? ওহ্ গলাটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কতদিন যে ভালো মাল পড়ছে না।

(লোকটা প্রায় তখনই যাবে বলে উঠতে যায়)

তন্বী : (ক্ষিপ্ত হস্তে বাধা দিয়ে) না। ও কোথাও যাবে না। ও আবার দেশে ফিরে যাবে, ও যুদ্ধ করবে। এতদূর পথ খামোকা এসে শেষে কিনা—

ও-মেয়ে : মাক্রভূমুর জন্য যুদ্ধ কুরুবেন ? জুংবুং দুহুর আপনি বীর—আপুনাকে আমি শ্রুদ্ধা কুরি। (মেয়েদের দিকে ঘুরে) আপনুরা সবাই কিন্তু নিশ্চই আসুবেন। হয় তু আমুদেব মধ্যে আমুরা একুটা শিলুয়ের ক্লাবও শুরু কুরু দিতু পাবে' তাহলে বুড়ু মুজার হবে! চুপুচুপু উকুউকু বুসু থাকতে বুড়ু খুরাব লাগে।

(চাকরানি— হাতে টেলিগ্রাম। চোখমুখ অন্যরকম)

আম্মা : কী ? কী হয়েছে ? তোমার চোখমুখ ও রকম কেন ?

চাকবানি · আপনাব নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

আম্মা : (কাঁপছে) আমার নামে ? দেখি, দেখি।

চাকবানি . বাড়ির খবর। (ফুঁপিয়ে) নতুন এক গ্যাস! বহু লোক মবেছে। এ গ্যাস নাকি সব কিছু ভেদ করতে পারে। চামড়ায় গিয়ে লেগে থাকে। কোনো গ্যাসমুখোসই আটকাতে পারে না এটাকে।

আম্মা : কোথায় ? টেলিগ্রাম কোথায় ? (টেলিগ্রাম পড়ে পাথর বনে যায়। প্রাণহীন গলায়) যারা মারা গেছে— আমাব স্বামী তাদের মধ্যে একজন।... এ না হয়ে বোধ হয় উপায় ছিল না।

কিশোব : আম্মা! আম্মা! কী হয়েছে আম্মা ?

(চিৎকার করে ডুকবে ওঠে)

আম্মা খোকা'

ও-মেয়ে আমি সত্যি দুঃখ্যুত! আমু আমার আন্তুরিক—মানে—হযো—শব্দুটা কী যেনু ? মুনু পুড়ছে না ছাই!

(লোকটা এক লাফুনিতে বন্দুক তুলে নেয়। মাথায় হেলমেট এঁটে দরজার পথে পা বাড়ায় কিশোরী ঘরে ঢোকে)

কুপোকাত

চরিত্র

খরগোশ

বাঘ

শেয়াল

মোষ

সজারু

হরিণ

ময়ূর

[দৃশ্য : অরণ্য। এক পাশে মাটির ঢিপি। তার গায়ে স্তম্ভের আকারে ইষ্টক চিত্রিত। দেখে মনে হবে যেন একটা কুয়ো, ঢিপির চুড়োয় তার মুখ।

ঘটনা : পশুদের জনসভা। আছে মোষ, ময়ূর, হরিণ, সজারু, শেয়াল ও খরগোশ। সভাপতি হলেন মোষ।]

মোষ : [করতালি শেষ হলে] বড়ই পরিতাপের বিষয় যে খরগোশ আমাদের সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হচ্ছে না। তাকে আমরা সকলে সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলেছি। জাতীয় স্বার্থে সকলেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। খরগোশ অবুঝ। সে কেবল নিজের জীবনকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। কে না জানে এক ভীষণ বাঘের অত্যাচারে আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন। এই ভয়ানক ব্যাঘ্র প্রত্যহ নির্বিচারে বহু প্রাণী হত্যা করে। কিছু খায়, কিছু ফেলে রাখে। আমাদেরই অনুরোধে শেয়াল বাঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপোষ-রফা করে। সেই অনুযায়ী স্থির হয় যে, অদ্য খরগোশ স্বেচ্ছায় মহামান্য বাঘের খাদ্য হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু খরগোশ এই প্রস্তাব মানতে অনিচ্ছুক। এখন উপায় কী ? আমি আর একবার শেয়ালকে বলি, আপনাদেরকেও বলি, খরগোশকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে রাজি করান।

শেয়াল : দেখ খরগোশ, আমি অনেক কষ্টে বাঘকে শান্ত করেছি। সে বলেছে যে তাকে যদি রোজ একটি করে জীব আমরা উপহার দেই, তবে সেদিন সে আর অকারণে অন্য জীব হত্যা করবে না। আজ তুমি বীরের মতো সহাস্যে এগিয়ে যাও, কাল তোমার পথ অনুসরণ করে অন্যজন যাবে। সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে তোমার ইচ্ছে করে না ?

খরগোশ : না। আমি অন্যের খাদ্য হতে চাই না। আমি নিজে খেতে চাই, বাঁচতে চাই।

সজারু : সে সকলেই চায়। কথা তা নিয়ে নয়। যে দিন আমার সময় আসবে, আমি পেছপা হব না। অবশ্য হয়তো আমাকে নির্বাচন করা কখনই ঠিক হবে না। কারণ আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা। চেহারাও বিদঘুটে। বাঘ হয়ত আমাকে দেখে, খাওয়ার বদলে ক্ষেপে যাবে। তাতে সকলের বিপদ আরও বেড়ে যেতে পারে। অবুঝ হোয়ো না। দেরি না করে বাঘের গুহায় চলে যাও।

মোষ : সজারু ঠিকই বলেছে। শেয়াল যা করে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করে।

ময়ূর : অবশ্য এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। সজারুর কথাও ঠিক আবার তার উল্টোটাও ঠিক।

শেয়াল : একটু পেখম ছড়িয়ে বলো, সবাই সহজে বুঝতে পাববে।

ময়ূর মানে, কদাকার হওয়ার যেমন সুবিধা অসুবিধা আছে, তেমনি বেশি সুন্দর হবারও অসুবিধা অনেক। আমি সব সময়ই যেতে রাজি আছি। যেদিন সকলে আমার যাওয়া স্থির করবেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে, আমি লক্ষ করেছি, আমাকে সামনে পেলে, সবাই খাওয়ার কথা ভুলে যায়। আমার শোভায় মুগ্ধ হয়। বেশি সুন্দর বলে কেউ খেতে চায় না। আমাকে খাওয়া চলে না বলে মনে করে। বাঘ তা পছন্দ নাও করতে পারে। তাতেও সকলের বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

হরিণ : কথা বাড়াস নে খরগোশ। লক্ষ্মী ভাই, তোর লেজে পড়ি, এবার যা তুই!

মোষ : বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বাঘ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে সমবেতভাবে থাকা মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

শেয়াল : সভাপতি সাহেব, সভা ভেঙে দিন। গর্জন শোনা যাচ্ছে। হয়তো এখানেই এসে পড়বে। খরগোশ না যেতে চায় এখানেই থাকুক। আপনি সভা ভেঙে দিন। আমরা বিদায় হই।

মোষ : সভা ভঙ্গ। বিদায়, বিদায়, বিদায়!

[খরগোশ ব্যতীত অন্য সকলের দ্রুত প্রস্থান]

খরগোশ : (একাকী)

কত গাজর কত মূলো কত না সুন্দর এই পৃথিবী,
স্বপ্নের মতো কচি কচি কত সবুজ ঘন বাঁধাকপি।
মরিতে চাহি না অল্প বয়সে,
চাহি নাক যেতে বাঘের গ্রাসে।
যে করে পারি রহিব আঁকড়ি লইব মাটির সুরভী,
আহা, কত গাজর, কত মূলো, কত না সুন্দর এই পৃথিবী।
সকালে বিকালে, পাতায় পাতায়, ঝরিবে আলোর ঝরণা,
ঘাসের ডগায়, ফসল মূলে, কাঁপিবে কত শিশির কণা।
আমি কি রব ব্যাঘ্র উদরে,
ঘুমায়ে পড়িব চিরতরে ?
চিবায়ে চিবায়ে দাঁতের ফাঁকে, লুটিবে মজা ঘোর পাপী।
আহা, স্বপ্নের মতো কচি কত সবুজ ঘন বাঁধাকপি।

[চিন্তাযুক্তভাবে পদচারণা।]

সকলে বলে
ভেজিটেবিলে
শক্তি বাড়ে বুদ্ধি গজায়!
ও ভাই পালং
ও ভাই মূলো
শীঘ্র বল মুক্তি উপায়।

গাজর কপি
মটর শুঁটি
খেয়েছি রোজ মজায় মজায়:
তবু কি আজ
হবে না কাজ
বিপদ যখন নাকের ডগায় ?

[প্রাণপণে কাঁচা তরকারি চিবিয়ে খায় এবং চিন্তা করে। হঠাৎ উল্লসিত হয়ে]

পেয়েছি পেয়েছি পেয়ে গেছি ভাই, বুদ্ধি, ফুর্তি, ফুর্তি'
এখনি দেখিবে, কেমনে হবে কার্য সিদ্ধি, ফুর্তি ফুর্তি'
বাবাজি ব্যাঘ্র দেখেছো মোষ, দেখনি কি খরগোশ,
বাঘের ছালে বানাব আজ নরম বালাপোশ'

[নেপথ্যে বাঘের গর্জন।]

বাবারে বাবা, কাঁপিছে প্রাণ, হাঁকিছে বজ্রনির্ঘোষ'
দেখিয়া দেরি আসিছে স্বয়ং, ক্ষেপেছে বেটা রাক্ষোস'
এখনই বুঝি, প্রবেশে আসি, তুলিয়া ধরিবে থাবা'
আসলে ফাঁকি, সকলি ভাণ, সাজিতে হবে গো হাবা'

[খরগোশ মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। বাঘের প্রবেশ]

বাঘ : আমি ক্ষুধার্ত। কথা ছিল সূর্য খাড়া মাথার উপর উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুপুরের খাদ্য আমার সামনে হাজির হবে। হয়নি কেন ?

খরগোশ : হুজুরে হাজির হলাম!

বাঘ : কিন্তু দেরি হলো কেন ?

খরগোশ : সে কথা মনে করেই তো কাঁদছি।

বাঘ : তোর মনে আবার এতো দুঃখ থাকবে কেন ? এতটুকু পশু তুই। তোর সুখই কী আর দুঃখই কী ?

খরগোশ : আমার অনেক দুঃখ। মনে অনেক কষ্ট'

বাঘ : আমার অভ্যন্তরে যেতে হবে বলে তোর এত দুঃখ! দেখ্ আমি হচ্ছি এই অরণ্যের সন্ত্রাস, যাকে বলে রাজা বাহাদুর। আমার ওপরে কেউ নেই। আমার ডোরাদার পেটের মধ্যে যেতে পারা তোর মতো ক্ষুদ্র পশুর পক্ষে এক মহা সৌভাগ্য!

খরগোশ : আপনার ওপরে আরেকজন আছে। সেই তো সব নষ্ট করেছে। সেই জন্যই তো কাঁদছি।

বাঘ : কী বললি ? অত ফোঁপাস নে। ফোঁপালে তোর গোঁফ আর পশম এত থর থর করে কাঁপে যে তাতে সব কথা আটকে যায়। কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে পারছি না। গোড়া থেকে বল। কাঁদছিস কেন ?

খরগোশ : আমি এত ছোট, এত সামান্য, পরিমাণে এত অল্প! আমাকে খেয়ে কি আপনার কোনো পরিতৃপ্তি হবে ? এই দুঃখে কাঁদছি।

বাঘ : আমি আবার তোর বেড়াল ভাইয়ের দাদা হই কি না, দিনেব বেলায় সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই না। কাছে আয় দেখি। তাইতো, তুই দেখছি সত্যি অতি ক্ষুদ্রকায়। শেয়াল পণ্ডিত দেখছি ভারি পাজি। বেছে বেছে সবচেয়ে শুটকোটাকে পাঠালো ?

খবগোশ : না না, হুজুর, শিয়াল মামার কোনো দোষ নেই। আপনার জন্য পাঠান হয়েছিল আমার সেজ আপাকে। ইয়া মোটাসোটা। কী হৃষ্টপুষ্ট!

বাঘ : এ্যাঁ! তাহলে তাব বদলে তুই এলি কী জন্যে ?

খবগোশ : সেই দুঃখেই তো কাঁদছি। সেজ আপাকে আরেকটা বাঘ খেয়ে ফেলেছে'

বাঘ : কী বললি ? আমার মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নিয়েছে ? এত বড় সাহস!

খরগোশ : সেজ আপাও কত কান্নাকাটি করল। বারবার আপনার কথা বললো। কিন্তু কিছুতেই শুনল না। ঐ বাঘটা দেখতেও ঠিক আপনার মতো। তবে আবও রাগী আরও তেজি। তাই তো কাঁদছি। তখন উপায় না দেখে সবাই আপার জায়গায় আমাকে ঠেলে পাঠাল। আমি কি আপনার খাদ্য হবাব যোগ্য ? আমার কি সেজ আপার বহর আছে, না সে বকম মেদময় অঙ্গ! আমাব কত দুঃখ' সে জন্যই তো কাঁদছি!

বাঘ : কাঁদিস না। আজ বোধ হয় তোকে বাইরেই জীবন কাটাতে হবে। কারণ আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে নিজের ঐ জাত ভাইটির ঘাড় মটকাই। রক্ত হাড় মাংস সব এক সঙ্গে মিশিয়ে লোকমা লোকমা খাই! কোথায় ওটাকে পাওয়া যাবে একবার আমাকে দেখিয়ে দিতে পারিস ?

খরগোশ : তা পারব। তবে আপনি সামনে থাকবেন, আমি পেছন পেছন এগিয়ে আসব। আপনার সংকল্প দেখে আমার দুঃখ একটু একটু করে কমছে।

বাঘ : কোনো ভয় নেই তোব। আমি সঙ্গে আছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যা। আমি আবার দিনের বেলায় সব ঠিক মতো ঠাহর করতে পারি না। শেষে ভুলে অন্য কাউকে সাবড়ে না দেই।

খবগোশ : আসুন। এই দিক দিয়ে আসুন। এই ঢালু পথটা দিয়ে একটু নিচে নামব। এরপর থেকে জঙ্গল কিছু ঘন হয়ে এসেছে। সাবধানে পা ফেলবেন হুজুর। এইবারে একটু উপবেব দিকে উঠতে হবে। পাহাড়িয়া পথ কিনা। এর মাথাতেই আপনার দুষমনের গুহা। আসুন আরেকটু এগিয়ে আসুন। আমার ভয় করছে। আপনি সামনে আসুন। গুহার মধ্যে চোখ দিয়ে ভেতরে নিচের দিকে তাকান।

বাঘ : কৈ কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

খরগোশ : হুজুরের বোধহয় আলোর ঘোর এখনো ভাল করে কাটেনি। আর একটু চেষ্টা করে দেখেন। কিন্তু সাবধান থাকবেন। আপনাকে দেখতে পেলে ও কিন্তু ক্ষেপে যাবে।

বাঘ — ঐ তো! ঐ তো! দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চকচক করছে অবিকল আমার মতো দেখতে। এ্যাঁ! এত বড় সাহস, আমাকে চোখ পাকাচ্ছে। খবরদার! আমাকে তুই হুমকি দিস?

খরগোশ — হুজুর!

বাঘ — না না। কোনো কথা নয়! ওর একদিন কি আমার একদিন। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? তোর মাথা ফাটাব, দাঁত ভাঙব, গোঁফ উপড়ে ফেলব, চামড়া খুলে ফেলব! কী আমাকে পাল্টা গালি দিচ্ছিস তুই? তবে রে ও জানোয়ার—হালুম! হালুম! হালুম!

[ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ও কুয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পানির মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ার এবং পরে তার মধ্যে হাবুডুবু খাবার শব্দ শোনা যাবে।]

খরগোশ — (নাচতে নাচতে)

হুররে হুয়া, কেয়া মজা, বনের রাজা কুপোকাত
কুয়ার মধ্যে দেখে ছায়া, ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত!
হুররে হুয়া কেয়া মজা, কেল্লা ফতে বাজিমাত!
বনের রাজা কুপোকাত,
ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত!
তাইতো বলি যত পারো কেবল খাও তরকারি
বাড়বে মেধা গায়ের বল, বুদ্ধি হবে তরবারি
গাজর মূলো শাক-সব্জি
শক্ত হবে হাতের কব্জি,
খেলে পরে পুঁই পালং টাটকা তাজা শালগম,
হবেই হবে সকল কাজে অতিশয় পারঙ্গম!

[যবনিকা]

মর্মান্তিক

একটি গীতি-রণ-রঙ্গনাট্য

চরিত্র

অধ্যাপক
প্রকটক
খোকন
মোমেন
বসুল
ফজল
প্রবোধক
ছাত্রদল
মাসুমা
সায়েবা
১ম তন্বী
২য় তন্বী
৩য় তন্বী
ছাত্রীদল

[মঞ্চের এক কোণে একটি চায়ের টেবিলে চারজন যুবক। একজন বেশি উত্তেজিত বলে সর্বক্ষণ বসে থাকতে পারছে না। টেবিলে ধূমায়িত চা সারিবদ্ধ সাজানো রয়েছে এমনকি চায়ের চামচগুলো পর্যন্ত একই দিকে হস্তাবিতে কাত করে রাখা। যুবকদের পোশাক টেনিস খেলার। সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেটস। গায়ে হাতকাটা নীল সোয়েটার, হাতে টেনিস র‍্যাকেট, সবার হাতে একই ভঙ্গিতে মুঠ করে ধরে রাখা। সংলাপের সময় না হলেও গানের সময় অবশ্যই, অন্যান্য সময়ও যখনই সম্ভব হবে, প্রত্যেকের হাত, পা, শরীর, হাতের র‍্যাকেট, চামচ সবই কথা ও সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়বে চড়বে। যে যুবক বেশি উত্তেজিত তার নাম খোর্শেদ। অন্যান্যরা মোমেন, রসুল, ফজল।]

সমবেত — আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ — সে ছিল আমাদের সহপাঠিনী
ছিল নাকি পথচারি যোগিনী উদাসিনী
কটিনে কোনোদিন করেনি কামাই,
আচল শাড়িতে খেলতো কতো না রোশনাই।
অথচ কী অখণ্ড মনোযোগে,
লেকচার শুনতো
নিঃশ্বাস প্রহত,
আড়চোখে তাকালে
কত না শর্মাতো।

সমবেত — আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ — একান্ত করে ছিল না সে
তোমার কি আমার
তবু ছিল কাছাকাছি,
প্রতিদিন নাম ডাকে সাড়া দিত
মনে হতো বেঁচে আছি, বেচে আছি।

কাঠের বেঞ্চিতে তার বসন এলায়িত,
গুরুর ঘন ঘন চিৎকারে ক্লাশঘর মুখরিত
হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে গুঞ্জরিত।

সমবেত : আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ : সায়েরা বানুর সবে প্রথম বর্ষ,
তিনটি বছর ছিল অনাগত।
কত না মধুর ছন্দে চিত্তপ্রকর্ষ
ক্রমে ক্রমে হতো বিকশিত।

সমবেত : আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ : আকস্মাৎ গুরুর এ-কী নির্মম আচরণ,
কেড়ে নিল শিষ্যের ধন, ছেড়ে উচ্চাসন।
মঞ্চে ও বেঞ্চিতে নির্ণীত ছিল শুধু
বাক্যের বন্ধ
কেন তাতে মেশালে
দিনে দিনে কৌশলে
হৃদয়ের স্পন্দন,
হতে হলো অপমানিত
চিরতরে অপসারিত।

সমবেত আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত

খোর্শেদ : চুপ করো, চুপ করো, বন্ধ করো আর্তনাদ,
সহ্য না হয় আর বিষণ্ণ বিষাদ।
মর্মে মর্মে নিহত হয়ে আমরাই কুপোকাৎ,
কর্মে কর্মে জেগে উঠো, শত্রুকে হানো আঘাত
তোমরা হও উত্তেজিত, হও কর্মে রত
শুধু বসে বসে হয়ে থেকো না মর্মাহত

সমবেত : আমরা উত্তেজিত
আমরা কর্মোদ্যত,
আমরা রব না রব না মর্মাহত।

আমরা উত্তেজিত,
আমরা জাগ্রত, জাগ্রত, জাগ্রত।

মোমেন : কিন্তু অধুনা সাযেবা বানু মেতেছে ভীষণ জ্ঞানার্জনে।

বসু : রাশি রাশি সহায়ক গ্রন্থ, ব্যর্থ সে পিপাসা নির্বাপনে

সাদেক : দিবানিশি ছুটে যায়, বুঝে নিতে পাঠ গুরুর সন্নিধানে

খোর্শেদ : ওগো অধ্যাপক, সুন্দর গুরু
তোমাকে তো চিনি আদ্যোপান্ত,
তোমার তো গ্রন্থের পৃষ্ঠা,
রমণীর অঞ্চল প্রান্ত।
ছাত্রীরে দিয়েছো বিদ্যার মূর্তি,
অতি স্বল্প হবে সিদ্ধির পরিপূর্তি।
রক্ষকই ভক্ষক শিক্ষক প্রেমাকাঙ্ক্ষী,
বিশ্ব ধ্বংসের আর বাকি থাকল কী।
ওগো কর্তৃপক্ষ, হও এখনও জাগরিত,
ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হলো যে ভ-বিকৃত।

সমবেত : আমরা উত্তেজিত
আমরা কর্মোদ্যত,
আমরা রব না রব না মমাহত
আমরা উত্তেজিত,
আমরা জাগ্রত, জাগ্রত জাগ্রত
চলো যাই অভিযোগ করি প্রকটক [illegible]

বসু : [illegible] তুলে তাঁর ধনুকে
[illegible]
মোক্ষম লক্ষ্যে হাতে-নাতে ধরে
সাজা দিক কপটে।

জলী : নতুবা অবর্ম নিধনে আমরাই
নামব ধর্মঘটে।

খোর্শেদ : হা হা হা। [illegible]
সিংহের বাচ্চা
যেই কথা সেই কাজ
সাচ্চা সাচ্চা।

সমবেত : চাচাচা চাচা।
জোড়ে জোড়ে পা
কণ্ঠে আওয়াজ [illegible]
আচ্ছা আচ্ছা।

সমবেত চাচাচা চাচা।

খোর্শেদ হাত মুঠ শির উঁচা
বাজে কুচকাওয়াজ
জান বাঁচা জান বাচা।

সমবেত চাচাচা চাচা।

খোর্শেদ প্রকটকে জানা
রণ ডঙ্কা আজ
জোরসে বাজা।

সমবেত চাচাচা চাচা।

(তালে তালে সারিবদ্ধভাবে প্রস্থান। চার তন্বীর প্রবেশ। তিনজন এক একজোটে, একজন স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রের নাম মাসুমা।)

তিন তন্বী ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।
এ-কী কাণ্ড গর্হিত।
প্রথম বর্ষের কন্যায় প্রণয়েচ্ছা।
এ যে অন্যায় অনুচিত।

মাসুমা তুমি গুরু, তুমি অধ্যাপক, অতি শ্রদ্ধাভাজন,
জ্ঞানমন্ত্রে মেনেছ জীবন-মরণ-সাধন।
চতুর্বর্ষ ধরে দেখেছি, তোমার কর্মধারা
দেখিনি কখনও প্রণয় কৌতুকে এতো মাতোয়ারা
বিদায় বেলায় দেখে যেতে হলো লুপ্ত তোমার সম্বিৎ,
বালিকার রূপ কেড়ে নিলো জ্ঞান, বিবেকের হিতাহিত!

তিন তন্বী এ-কী কাণ্ড গর্হিত,
এ যে অন্যায় অনুচিত।
প্রথম বর্ষের কন্যায় প্রণয়েচ্ছা,
ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।

মাসুমা শুধু ধিক্কার নিন্দায় হবে না শান্ত
অন্তর মাতন,
দেখে যেতে চাই তার চরম শিক্ষা অপমান
নির্যাতন।
এম এ পরীক্ষা সদ্য করেছি সমাপ্ত
ত্যাজিনি বিদ্যাভবন,
এরি মধ্যে আমারে বঞ্চিয়া করেছো হিয়া
ষোড়শীরে সমর্পণ।

জানে গো জানি; কোন গুণে করেছ
নবীনারে মোহিত,
তোমার এ কীর্তি গুরুজন মাঝে
তুলনা রহিত।

তিন তন্বী : এ-কী কাণ্ড গর্হিত,
এ যে অন্যায় অনুচিত।
প্রথম ধর্মের কন্যায় প্রণয়েচ্ছা
ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।

মাসুমা : তাই বলে, হইনি উদাসীন প্রসাধনে,
রীতিমতো করি সাজসজ্জা।
তোমার কুকাণ্ডে হইনি হতবুদ্ধি,
আদৌ যাইনি মূর্চ্ছা।

তিন তন্বী : মাসুমা মাসুমা তুমি নও একা,
আমরা তোমার দুঃখ সুখের সহচর।
ধর না ধর না নম্র লতিকা
হানব আঘাত রুদ্র ভয়ঙ্কর।

১ম তন্বী : যুদ্ধ এবার গৃহ সীমান্তে,
ক্ষুব্ধ চেতনা বোধে উদ্বেল।

২য় তন্বী : হানাদারে দিতে শিক্ষা
শিখেছি চালাতে রাইফেল।

৩য় তন্বী : না যদি হয় কথার বাধ্য
বিদ্ধ হবে হৃদয়ে শেল।

মাসুমা : ভয় নাই মোর ভয় নাই আর
তোমরা করেছ অঙ্গীকার,
এবার তবে পুরুষগুরুর
চূর্ণ করিব অহঙ্কার।
বিলাপে নয় কালক্ষয়,
কর্মে হোক পরিচয়।
মর্মে মর্মে বোঝাব তারে
প্রণয় নয় রঙ্গময়।

তিন তন্বী : তবে বিলম্বে কী কাজ
তোরা পরে নে পরে নে সাজ।
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।

চল যাই সাব বেধে
গুরুজীব কক্ষে,
দেখে নেব অদ্য
কে কাহাবে বক্ষে।
যদি আজ কন্যা
এসে পড়ে অচিবাৎ,
নিশানায় নির্ভুল
আঘাতিব নির্ঘাৎ।
সম্মুখে পা ট্রিগাবে হাত
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাধ।

মাসুমা — ওবে তোবা থাম বে থাম
এখনি চলে যাসনে।
জপিতে জপিতে গুরুব নাম
কে যেন আসিছে এখানে।

তিন তন্বী — চলো যাই তাড়াতাড়ি অ ডালে লুকাই,
এ যে দেখি মেয়ে নয়, জ্বলন্ত আশনাই।

(সায়েবা বানুব প্রবেশ)

সায়েবা — আমি তন্বী, আমি ছাত্রী, আমি সম্রাজ্ঞী,
লভেছি স্বাদ, জেনেছি অদ্য, অনুবাগ কী।
না কবিব না কবিব আব ট্যুটোবিল ক্লাশ,
পাঠাগাব কাবাগাব জীবন-সন্ত্রাস।
জ্ঞানভাণ্ডাবি প্রেমকাণ্ডাবি জানো না কি ;
সেই মহাজনে জাগবে স্বপনে সাথে বাখি।
আমি তন্বী, আমি ছাত্রী, আমি সম্রাজ্ঞী,
লভেছি স্বাদ, জেনেছি অদ্য, অনুবাগ কী।

তিন তন্বী — শোনো গো প্রথম বর্ষেব কন্যা,
ভোবো না নিজেকে পুলক ধন্যা।
জানো না কি গুরুজীব পাবিত্রিব বন্যা
উপচিত জনে জনে কেহ নহে অনন্যা

১ম তন্বী — মনীষী নয় কোনো ঐ তরুণ তাপস,
গুরুগিবি শুধু ছলনা, অন্তবে আতশ।

২য় তন্বী : শুনেছি তাব বৌ আছে, গেছে পিত্রালয়ে
ব ধাবে অনর্থ অনিবার্য, মহাবিদ্যালয়ে

৩য় তন্বী আছে কাচ্চা বাচ্চা গণ্ডা গণ্ডা,
শ্যালকেরা অতিশয় ষণ্ডা ষণ্ডা।

(সবটা সমবেত ভাবে পুনরাবৃত্ত হবে এবং তন্বীগণ ক্রমশ সায়েরা বানুর নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করে ব্যূহ রচনা করে ঘিরে দাঁড়াতে থাকে।)

সায়েরা : আহা তোমরা সবাই কত ভালো,
পরহিত চিন্তায় ঘুম নাই
যদি খুঁজে পেলে অন্যাচার,
আশু প্রতিকার করবেই।
কিন্তু শুনো গো মানবী দেবিনী,
তোমাদের করি জোড় হাত,
সুনীতির কথা শুনিতে পারি না
আমি তো নহি তোমাদের ধাত

তিন তন্বী সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাধ।
তোরা পরে নে পরে নে রণ-সাজ,
এসেছে সময়, রেখে দে অন্য কাজ
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাধ।
যেতে নাহি দিব কারে গুরুজীর কক্ষে,
দেখে নেব অদ্য কে কাহারে রক্ষে।
তবু যদি কন্যা চলে যায় অচিরাৎ
নিশানায় নির্ভুল আঘাতির নির্ঘাৎ
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।

সায়েরা : এ-কী তোমাদের ষড়যন্ত্র,
অকারণে করো অবরোধ।
বুঝেছি তোমাদের সুনীতির মূলমন্ত্র,
নহি তো অবলা নির্বোধ।
ভেবেছো বুঝি বিগত যুদ্ধে ভীত সন্ত্রস্ত,
ছিলাম কেবল পাঠে মগ্ন
চালাতে বুঝি শিখিনি কোনো মারণাস্ত্র,
আসেনি রণ-লগ্ন।

(সমূহ

খোর্শেদ হাহাহাহ
সিংহের বাচ্চা
যেই কথা সেই কাজ
সাচ্চা সাচ্চা।

সমবেত চাচাচা চাচা

খোর্শেদ জোড়ে জোড়ে পা
কণ্ঠে আওয়াজ
আচ্ছা আচ্ছা।

সমবেত হাত মুঠ শির উঁচ
বাজে কাঁকাওয়াজ
জান বাচা জান বাচা।

সমবেত চাচাচা চাচা

খোর্শেদ প্রকটকের জান
রণডংকা আজ
জোরসে বাজা।

(কাড়া-নাকাড়ায় রণবাদ্যের তাল শুরু হবে।)

সমবেত জাগো জাগো প্রকটক
জলদি, জলদি,
কাটো কাটো কন্টক
জলদি জলদি
প্রকটক প্রকটক জাগো
প্রেম কন্টক কন্টক কাটো
জলদি জলদি।
অংকুর বৃক্ষ কাণ্ড উৎপাটো
জলদি জলদি,
প্রেম ভৃত্য দুর্বৃত্ত সংহারো,
জলদি জলদি,
ভাংগো ভাংগো পীরবিতির ভণ্ড
জলদি জলদি,
তুলে ধর শক্ত বংশদণ্ড
জলদি জলদি।
গেল চলে রসাতলে বিশ্ব
প্রকটক প্রকটক।

গুরুজীর করতলে শিষ্য
প্রকটক প্রকটক।
রক্ষো রক্ষো প্রকটক রক্ষো
জাগো জাগো প্রকটক জাগো
প্রেম কণ্টক, কণ্টক কাটো
অংকুর বৃক্ষ কাণ্ড উৎপাটো,
প্রেমভৃত্য দুর্বৃত্ত সংহারো,
সহপাঠি তন্বী ছাত্রী উদ্ধারো

(এক প্রকার জমকালো সামরিক পোশাক পরিহিত প্রকটকের প্রবেশ, গলায় দূরবীন। প্রকটকের গানের মধ্যে, ঠিক আর চং পরপরই, তালে তালে, সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি জলদি জলদি শোনা যাবে।)

প্রকটক — এত গোলমাল, কিসের জন্যে।
এত চিৎকার কিসের জন্যে,
এত হাজগোজ, লাফালাফি [illegible]
কিসের জন্যে?
নৃত্যগীত প্রণয় [illegible]
ছাত্র বয়সে ঘোর [illegible]
জানো না কি?
তবু [illegible] হলো
কিসের জন্যে,

সমবেত — গেল গেল রসাতলে বিশ্ব,
প্রকটক, প্রকটক।
গুরুজীর করতলে শিষ্য
প্রকটক, প্রকটক।
দূরবীন, দূরবীন দূরবীন তোলো
তাড়াতাড়ি করো।
ফার্তির কারবার এস্তার হলো
তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি করো।

প্রকটক — ছিন্ন কোরো না কর্ণ পটাহ,
চিত্ত আমার, এমনিতেই তপ্ত কটাহ।
নিত্য নতুন নব উৎপাত
যাকে না দেখি সেই চিৎপাত।

(দূরবীন তুলে নানাদিকে দৃক্‌পাত)

মোমেন — না না না, ওদিকে নয়,
ওখানে তো কিছু হয় না
কবিডোবে শুধু, হয়তো বা কভু,
কথা বলাবলি হয়।
তার বেশি কিছু হয় না।

(প্রকটক অন্য দিকে ছুটে গিয়ে দূরবীন তুলে ধরে)

রসূল — না না না ওদিকে নয়
ওখানেও কিছু হয় না।
পাঠাগারে শুধু, হাসি হাসি মৃদু,
খাতা বিনিময় হয়,
তার বেশি কিছু হয় না

(প্রকটক আরেক প্রান্তে ছুটে যায়)

ফজল — না না না ওদিকে নয়
ওখানেও কিছু হয় না।
মাঠে প্রান্তরে শুধু, হয়তো বা কভু,
ছোঁয়াছুঁয়ি একটুকু হয়,
তার বেশি কিছু হয় না

(অন্য এক স্থানে গিয়ে দূরবীন তুলেই স্তব্ধ হয়ে যায়)

প্রকটক — ঠিক ঠিক এই বার দূরবীন ভেদিয়াছে লক্ষ্য
চুপ চুপ চোখ মুখ কম্পিত শেলাঘাতে বক্ষ,
রোষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, মুখে নেই বাক্য।
প্রকটক প্রকটক রক্ষো, রক্ষো।

প্রকটক — চিনি। এ মেয়েকে আমি চিনি।
প্রথম বর্ষের ছাত্রী, একটু গরবিনী।
রোল নং সতের, হস্টেলে থাকে
কী করে এখানে, এলো কোন ফাঁকে,
আমি তো জানতে পারিনি,
চিনি, এ মেয়েকে আমি চিনি,
প্রথম বর্ষের ছাত্রী,
একটু গরবিনী।

(আরেকবার দূরবীন তুলে দেখে)

তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা।
শুধু-ছাত্রীতে এত মেশামেশি।

ফিস ফিস করে এত কিসের শল্লা
কেন বারবার এত হাসাহাসি'
(দূরবীন তুলে আরো একবার দেখে)
তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা!
দেখো দেখো বসেছে কত কাছাকাছি'
বেহায়া বেহদ্দ বেলেল্লা
এ-কী এ-কী করছে শুরু নাচানাচি।
তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা, তওবা তওবা।

ছাত্রদল : তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করো।
ছুটে গিয়ে উভয়েব পাকড়ো পাকড়ো।
যদি বলো খববেগে আমরাই ছুটে যাই,
এক কোপে জোড়া ঘুঘু করে দি জবাই।

প্রকটক : চুপ চুপ চুপ কবো কসাই, কসাই
এটা ভার্সিটি, নয় খামাব গোযাল
আমি প্রকটক, নই কোতোয়াল।
লাল বই দেখে দেখে ছুরিকা চালাই,
চুপ চুপ চুপ কবো কসাই কসাই।
আইনের ফাইনের মাব প্যাঁচ কত শত।
আমি শুধু প্রকটক, নই দণ্ড মুণ্ডের হর্তা
দেখে যাই টুকে যাই, যা কবেন কর্তা।

সমস্বরে · প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো পরিচয়।
কে সে, কোথা সে, প্রকাশো পবিচয, আছে কি হৃদয।
নীতি গেল বসাতলে সব হলো প্রেমময়
কোথা তুমি মহাবীব, এসেছে প্রলয় প্রলয়।

প্রকটক : প্রকটক শুধু প্রকটিতে জানে
কিন্তু, প্রবোধ দিতে জানে কে;

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক'

প্রকটক . গেবো বেঁধে দিতে সকলেই পারে
কিন্তু লটকে দিতে আসে কে,

সমস্বরে : প্রবোধক প্রবোধক প্রবোধক!

প্রকটক : নামে বোলে পরিচয় অনেকে জানে,
কিন্তু, মনেব খবর রাখে কে;

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক।

প্রকটক : গোলমালে ছুটোছুটি সকলে করে,
কিন্তু আসল চাল চালে কে ?

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক।

প্রকটক : জপ করে তার নাম ডাকো ক্ষণে ক্ষণে
আরো জোরে ভাই সব হাঁকো প্রাণপণে।

সমস্বরে : প্রবোধক! প্রবোধক ! প্রবোধক!

(চার বয়োঃবৃদ্ধ প্রবোধকের প্রবেশ। চারজনেই আলখাল্লা পবা, দীর্ঘদেহী, গুরুগম্ভীর শ্মশ্রু গুম্ফধারী)

প্রবোধক : আমরা প্রবোধক, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষক!
অন্যায় অবিচার পীরিতি প্রণেয়ো মোক্ষক।
হও শান্ত, ধরো ধৈর্য, শোনো আমাদের পরামর্শ,
হবে প্রতিকার, অন্যায় অবিচার, হয়ো না বিমর্ষ

(দলবদ্ধভাবে মেয়েদের প্রবেশ)

ছাত্রীদল : ধন্য ধন্য প্রবোধক, শোনালে বাণী পূণ্যময়,
তুমিই প্রতিপালক, শুদ্ধ করিলে বিদ্যালয়।
দণ্ড ধরো কঠিন করে, বিদ্ধ করো যুগল হৃদয়,
চরণ ধরে রইবো পড়ে, ক্ষতের করো নিরাময়।
আমরা নারী, তোমার পূজারি, হয়েছি আজ নিসংশয়,
নীতির তুমি মহান রূপক, শ্মশ্রুধারী গুম্ফময়।

প্রবোধক : চারিধারে অবিরামে ঘোরে মোদের বহু চর,
ক্রমাগত পাপাচার বাড়ে তবু বহুতর।
লেখাপড়া ক্লাস করা সবই হলো বিঘ্নকর!
অধ্যাপকে ছাত্রী লয়ে নৃত্য করে দ্বিপ্রহর।

খোর্শেদ : দোষ নেই দোষ নেই দোষ নেই কোনো
সদ্য আগত শ্রীমতি অবলার,
গুরুজী কুশলী সেজেছে মুরলী মোহনো,
কঠিন শাস্তি এখনি করো তার

মাসুমা : কে বলে তারে সরলা বালিকা
ছলমাময়ী চতুরা,
নিজেরে করেছে সুরভী কলিকা,
পুরাতনী হলো ধুতুরা।
কুন্তলে হরি হিঁচড়িয়া আনি
বহিষ্কারো কুটিলা নারী।

জ্বলিবে মর্মে, গুরু হবে জ্ঞানী
অঙ্গে লাগিবে শীতল বারি।

বোধক : মন দেয়া নেয়া চলবে না স্পষ্ট মোদের নীতি,
হোক সে নর হোক সে নারী শাস্তি পাবে দুর্মতি।
পথ প্রদর্শো প্রকটক, প্রবেশো প্রণয় কক্ষে
যেখানে কন্যা রয়েছে লগ্না গুরুর কণ্ঠ বক্ষে।

(এরপর থেকে কথা ও গানের অধিকতর উদ্দীপনামূলক দ্রুততর তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে ছাত্র ছাত্রী, প্রবোধক প্রকটক বিভিন্ন সারিতে আবদ্ধ হয়ে এক প্রকার সামরিক শৃঙ্খলায় মার্চ করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হবে।)

প্রকটক : হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার।
দুর্নীতির উচ্চশির চূরমার।
হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার।

ছাত্রদল : এসেছে ছাত্র ঐক্য জেগেছে কর্তৃপক্ষ
পরে মেতেছে সর্বদল।

ছাত্রীদল : হাঁকিছে সৈন্যাধ্যক্ষ আজিকে দক্ষযজ্ঞ
বুঝিবে কর্মফল।

সমস্বরে : ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
প্রকটকো প্রবোধকো জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

(অধ্যাপকের কক্ষ। এক হাতে বই অন্য হাতে কুর্সি টেনে নিয়ে অধ্যাপক নিজেই পট পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারেন। চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি ভঙ্গি রীত্যায়িত ও তাল লয় সম্বলিত। সায়েরা প্রবেশ করে নৃত্যের ভঙ্গিতে। নানা ভঙ্গিমায় অধ্যাপকের হৃদয় বন্দনা করে, তাকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত হয়। অধ্যাপক তৃপ্তির সঙ্গে এই স্তব গ্রহণ করে, মাঝে মাঝে চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে একটা কৃত্রিম অতি আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।)

অধ্যাপক : আহা বেশ বেশ অতি উত্তম
এই তালে তালে ভালোবাসা
প্রণয় নিবেদন।
কাছে এসো আরো না করো শরম
কাঁধে হাত রাখো, চোখে ভাষা
জ্বলুক হতাশন।

ভালো ভালো দূবে রাখো সম্ভ্রম
দূববীনে দেখেছে খাসা
ঘটনা চিরন্তন।
শুরু হবে আজ যুদ্ধ চরম
মাসুমা ত্যাজিবে উচ্চ আশা
বিদেশী সম্মোহন!

সায়েরা : হাত কাঁপছে
পা টলছে
মন বলছে
ছুটে আসছে
শুনবে না কোনো কথা প্রথমেই নির্ঘাত
চারিদিকে দেখে শুনে হানবে আঘাত।
ভেবেছিলে ক্ষেপে যাবে শুধু একজন
ক্ষেপে গেছে জনে জনে সজ্জন দুর্জন।
তেড়ে আসছে
হাত কাঁপছে
পা টলছে
মন বলছে
দেবে নাকো ফুবসত বলতে
নানা হও কী করে কী মতে।

অধ্যাপক : তুমি মোর ভাগ্নিব কন্যা কাছাকাছি সুবাতে
ছাপ দেয়া ভর্তির ফর্মে লেখা আছে কালিতে।
জানা আছে ফন্দি কৌশল প্রকটকে মানাতে
কুলোপানা চক্কর শুধু বিষ নেই ফণাতে।

সায়েবা : তবু ভালো লাগে না ভালো লাগে না
এই মিথ্যা অভিনয়,
তোমাব মাসুমা তোমাব প্রণয়
নিজে নিজে করো জয়।
তাছাড়া গুরুতর আরো আছে ভয
যে বালক আমারে দিয়েছে হৃদয
সে তো কতবার বুঝেও অবুঝ হয়,
বুঝিবে কি কপট হৃদয় বিনিময়?

অধ্যাপক : দোহাই তোমার তর্ক করে
নষ্ট কোরো না সময়
মাসুমাব মনে জেগেছে ঈর্ষা
উথলে উঠেছে ভয়,
শুধু দু'মিনিট আর দু'মিনিট
বন্ধ কোবো না প্রণয়।
যে করে পারো মুখ বুঁজে সও
প্রাণপণে করো অভিনয়।
অঙ্গে আনো দোল, কটাক্ষ বিলোল
ভালোবাসো চিৎকাব কবে,
যত দূবে থাক হবে হতবাক
বিঁধিবে শলাকা অন্তবে।

(পববর্তী অংশ গীত এবং অভিনীত হবে অতি উচ্চ কণ্ঠে এবং অতিবঞ্জিত ঢং-এ। হস্ত প্রসাবণ, নতজানু নিবেদন, জোড়-কব বক্ষে ধাবণ ইত্যাদির সাহায্যে প্রেমাভিনয়ের চূড়ান্ত হবে।)

সায়েবা : ওগো সুন্দর, ওগো প্রিয়তম, ওগো পরাণের ধন।
(নিম্নকণ্ঠে) ওগো দুর্জন, ওগো মাতামহ, এ যে অসহ প্রতাবণ।

অধ্যাপক : আহা মধু বরিষণ, মধুর বচন
আজ, দয়া কবে কবো হৃদয়ে বরণ।
(নিম্নকণ্ঠে) আড়ালে বসেছে কন্যা, টেনে আববণ,
শোনাও তাহারে অদ্য অকথ্য কথন।

সায়েবা : শোন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সপেছি আত্মহারা
আমার এ তনুমন,
ভালোবাসি রাশিরাশি ভালোবাসি ভালোবাসি দিবানিশি
ভালোবাসি অনুখন।

অধ্যাপক : ভালোবাসি তোমাকে আপাদমস্তক
ইস্তক পাতলী পাদুকা,
ভালোবাসি সব, কুন্তল পদনখ,
দেহের শোণিত কণিকা।

দুজনে : ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি
ভালোবাসি রাশিরাশি, ভালোবাসি দিবানিশি
ভালোবাসি নাচিনাচি, ভালোবাসি হাসিহাসি
ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।

(মঞ্চান্তরালের কোনো উচ্চ স্থান থেকে লম্ফ দিয়ে মঞ্চে উটকো হয়ে পড়ে প্রকটক। তড়াক করে লাফিয়ে সোজা হ

প্রকটক : সাবধান অধ্যাপক সাবধান, আমি প্রকটক,
দেখেছ কেবল পুষ্প বাগান, দেখনি কণ্টক।

অধ্যাপক : সালাম জনাব সালাম, বসতে আজ্ঞা হোক।

প্রকটক : উঠবস আমি অনেক করেছি, বিনা আমন্ত্রণে,
এবার তোমাকে বমাল ধরেছি, ভাগ্যে শুভক্ষণে।
রয়েছে বিধান রাখো ব্যবধান, ছাত্রী গুরুজনে,
নবনারী সব রহিবে পৃথক, আমি মধ্যিখানে।

অধ্যাপক : এত উত্তেজিত হওয়া নিষিদ্ধ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে
কোনো অপরাধ কলহ-বিবাদ, করিনি সজ্ঞানে।

প্রকটক : ক ৲ চাতুরি, মিছে কারিগরি, এই দেখ ফিতে
দর্জির হিসেবে হদিস মিলিয়ে ছিলে কত মেতে।
এক ফুট দুই ফুট তিন ফুট চার ফুট
এখন হয়েছে মুখ লজ্জায় ক টুক!
তখন, ছিলে নাকো দূরে, এসেছিলে কাছে সরে
এক দুই তিন গিরে, কত কিনারে কিনারে।

(প্রবেশ ছাত্রদল)

ছাত্রদল : ওহো কী মর্মান্তিক
এসেছিল নিকটে অতি আত্যন্তিক।
ছুঁয়েছিল শুধু কি অঞ্চল প্রান্তিক
ওহো কী মর্মান্তিক!

ছাত্রীদল : দেরি নয় দেরি নয় আর
নেই কোনো ব্যাখ্যার দরকার।
ফিতে মেপে দেখা গেছে, কত কম ইঞ্চি
কাছে ঘেঁসে করেছে সুনীতির নিকুচি।
নাম কেটে হল থেকে বের করে দাও,
বেঁচে যাবে গুরুজন, দুর্নীতি উধাও।

(প্রবোধকের প্রবেশ)

প্রবোধক : শো-কজ শো-কজ শো-কজ, প্রবোধক নিয়ম অটল
আগে করি জারি শো-কজ তারপরে করিব কতল।
অন্তর অগ্নিতে ক্রমাগত,
গুম্ফ শ্মশ্রু হতেছে স্ফীত।

তবু ন্যায় বিচারে অবিচল,
শো-কজ শো-কজ শো-কজ প্রবোধক নিয়মে অটল।

অধ্যাপক : প্রণয় পরিমাপ, নহে দর্জিগিরি
কখনো কপট খেলা, কখনো ছলনা।
অনুমোদ্য কিছু কিছু প্রতারণা!
এই শ্রীমতির অত কাছে আসা কেবলি প্রবঞ্চনা,
নিকট সুবাতে নাতিনী আমার, আমি হই নানা।

ছাত্রদল : জানি জানি সব জানি
খালাতো বোন, নানা নাতনী!
লুকোচুরি সব ফাঁস হলে
সাধু সন্ন্যাসী সব তাই বলে।

মাসুমা : যদি তাই হয় তাই হয়,
শান্ত হও অশান্ত হৃদয়!
যদি তাই হয় তাই হয়
প্রকটকে হবে কি প্রত্যয়:
যদি তাই হয় তাই হয়
মিথ্যা শঙ্কা, সব ভয়।
যদি তাই হয়, তাই হয়।

প্রবোধক : জিজ্ঞাসো জিজ্ঞাসো প্রকটক আরও স্পষ্ট ভাষায়
প্রকৃতই আছে কিনা সত্য এই নব্য ঘোষণায় ?

প্রকটক : আছে কোনো চিরকুট, কোনো দলিল খতিয়ান
কোনো কপি ফটোস্ট্যাট, কোনো অকাট্য ফরমান ?

(অধ্যাপক কর্তৃক ফর্ম প্রদর্শন। এক রকম থাবাথাবি পড়ে যায়। প্রথমে প্রকটক, তারপর ক্রমান্বয়ে ছাত্রদল, ছাত্রীদল, সবশেষে প্রবোধক পরীক্ষা করে।)

প্রকটক : হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ তাইতো এইতো
উপাচার্যের স্বাক্ষর।
লেখা আছে ফর্মের লাইনে
লাগানো সীল মোহর!

ছাত্রদল : আরে বাবা তাইতো এইতো
জাল নয় এক চুল,
মিছেমিছি হয়েছি ভাবিত
আগাগোড়া সব ভুল!

ছাত্রীদল : কী আনন্দ তাইতো তাইতো
হয়েছি প্রবঞ্চিত।
মন চঞ্চল কম্পিত অঞ্চল
হৃদয় আলোকিত।

সায়েবা : গুরুজনে কেউ ভালবাসে কি ?
আমার উনি মাতামহ।
সফল করিতে দুরভিসন্ধি
আমি হয়েছি আজ্ঞাবহ'
কোথাকার কোন্ প্রণয়ী ওঁর
বিদেশ গমনে উদ্যত,
মেগেছে আমার সহায় গুণী
তাহারে করিতে বিরত।
কাতর করুণ আবেদনে তাঁর
কুক্ষণে হই সম্মত,
এবার এখন অবসর চাই
নিজের মনের মতো।

প্রবোধক : কী আশ্চর্য তাইতো তাইতো
খামোকা হয়েছি হয়রান।
প্রকটক বড় বেবুঝ তুমি
তাড়াতাড়ি করো প্রস্থান।
নানা নাতনীতে রঙ্গ রস
এদেশে প্রাচীন প্রথা
অযথা তাতে চাহিলে কেন
গলাতে তোমার মাথা;

সমস্বরে : ওহো কী মর্মান্তিক'
তীরে এসে তরী ডোবা
বলিব কী অধিক!
ওহো কী মর্মান্তিক!

প্রকটক : যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল আমি প্রকটক।
অচিরে ধরিব প্রেমপাপী পুরির ফাটক !
যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল আমি প্রকটক,
আমি চলে গেলে প্রবলতর, আসিবে ঘাতক,
যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল, আমি প্রকটক।

সমস্বরে : ওহো কী মর্মান্তিক,
প্রবোধকে হতে হলো
ব্যর্থ অভিযাত্রিক।
ওহো কী মর্মান্তিক!

(গায়ের চাদর অপসারিত করে অতি ঝলোমলো পোশাকে মাসুমা মেয়েদের দলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে যায়)

মাসুমা : ক্ষমা করো ক্ষমা করো হৃদয়েশ্বরো
যাব না যাব না বিদেশে একা,
দুদিনে বুঝেছি মর্ম যাতনা কত
কোথাও কখনো পৃথক থাকা।
থিসিসে পিপাসা মিটিবে না মোর
যদি না জানি নিশ্চিতে
আঁধারে বাড়াব যতবার হাত
পাবিব তারে স্পর্শিতে।

অধ্যাপক : মাসুমা করিও ক্ষমা,
যদি করে থাকি অপরাধ।
হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে রমা,
রচেছি কুটিল ফাঁদ।

ছাত্রীদল : দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয় আর
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়েছে অঙ্গীকার।

(ক্রমশ রঙ্গমঞ্চ বহুবর্ণের আলোক রশ্মিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে এক মহোৎসবের পরিবেশ রচনা করে। মাসুমার নাচে হৃদয় নিবেদনের বিভিন্ন মুদ্রা পরিপূর্ণ আনন্দের পুষ্পকে বিকশিত করে। পরিসমাপ্তি লাভ করে লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠিতা নববধূর উপবেশনের ভঙ্গিমায়। পেছনে নানা সারিতে তরুণ তরুণীর দল চক্রাকারে নৃত্যরত। তাদের সমবেতকণ্ঠে যে গান ধ্বনিত হয় তার ধূয়া।)

ভালো ভালো ভালোবাসা, ভালো ভালো প্রণয়
তার চেয়ে ভালো পরিণয়।
বলো জয় জয় প্রেমের জয়
পরিণামে যার পরিণয় পরিণয়।

[যবনিকা]